বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

মোহিতলাল মজুমদার

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষ তিথি
৩রা মাঘ, ১৩৬৯

মুদ্রাকর: শ্রীমদনমোহন পাল,
সুরেন্দ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২এ, ভোলানাথ পাল লেন,
কলিকাতা—৬

সঙ্কলয়িতার নিবেদন

স্বনামধন্য কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এক সময়ে 'বাংলার নবযুগ' সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেন। পরে সেই-গুলির কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া 'বাংলার নবযুগ' নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। 'বাংলার নবযুগে' স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং তাহাকে স্বামীজীর অবদান সম্বন্ধে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনার জন্য অনুরোধ করিযাছিলাম। একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন এই কার্য্যে তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দের পৌরুষ, চরিত্রবল ও হৃদয়বৃত্তির কথা বলিতে বলিতে দ্রষ্টা মোহিতলাল আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। তাঁহার নানা গ্রন্থে ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তিনি এই বিরাট পুরুষের বিবিধ অবদান লিপিবদ্ধ করিয়া গিযাছেন। সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রচনা হইতে 'বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' সংকলিত হইল। আবশ্যকবোধে কোন কোন রচনার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন অথবা স্থান বিশেষে কোন কোন রচনার কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধন করিয়া পাঠক্রম অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই বরং আশঙ্কা হইতেছে খাদ মিশাইবার জন্য আসল স্বর্ণের মূল্যমান হ্রাস করিবার অপরাধে আমি অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গভারতীর উপহারের জন্য এই অমূল্য অলঙ্কারটির আবশ্যক ছিল। অলঙ্কার গড়িতে হইলে একটু খাদের মিশ্রণ অপরিহার্য্য, এই কথা স্মরণ করিয়া আশা করি, পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন। এই গ্রন্থ স্বামীজীর জীবনের ঘটনা বা তথ্য-সংগ্রহ নয়, কিন্তু তাহাকে ভিত্তি করিয়া সেই মহাজীবন পাঠকের দৃষ্টিপথে ধরিয়া তুলিয়াছেন মোহিতলাল,—ঠিক যেন নিপুণ ভাস্করের ন্যায় ঐ সকল উপাদান খোদাই করিয়া এক জীবন্ত বিগ্রহরূপে।

যে সকল গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা হইতে মোহিতলালের এই রচনা সংকলিত হইল তাহাদের প্রকাশকগণের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মোহিতলালের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান আমার অনুজ-প্রতিম

শ্রীকেশবচন্দ্র সরকারের অদম্য উৎসাহ ও অকুণ্ঠ সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থ সংকলন ও প্রকাশন এত শীঘ্র সম্ভব হইত না। 'বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' পাঠান্তে যদি কোনও সাধুবাদ কেহ প্রদান করেন তবে তাহা নিঃসন্দেহে কেশবচন্দ্রেরই প্রাপ্য। ইতি—

বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী
১৩৬৯

নিবেদক
সুরেশচন্দ্র দাস

গ্রন্থকার

১৩৪৯ সালের আষাঢ় মাসে মোহিতলাল সংকলিত ও সম্পাদিত কবিতা-সংগ্রহ 'কাব্য মঞ্জুষা' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের শেষভাগে একটি 'কবি-পরিচয়' অধ্যায় আছে। তাহাতে তিনি নিজের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ঃ

"বাংলা ১২৯৫ সালে ১১ই কার্ত্তিক শুক্রবার, ২৬ অক্টোবর, ১৮৮৮ রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বৈদ্যবংশে জন্ম; পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার, মাতার নাম হেমমালা দেবী। পিতা ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের জ্ঞাতি-ভ্রাতা;—দেবেন্দ্রনাথের পিতারও পূর্ব্ব উপাধি ছিল 'মজুমদার'। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বংশ ও তাঁহার মাতুল বংশেরই এক শাখা। মোহিতলালের কৈশোর ও স্কুলজীবন বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয়; বাল্যে কিছুদিন কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী হালিসহরে মায়ের মাতুলালয়ে থাকিয়া তথাকার স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। নিজের সম্বন্ধে মোহিতলালের যে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হয় তাহা এই। স্কুলের ও কলেজের, (তিনি তখনকার 'মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশান' এখনকার 'বিদ্যাসাগর কলেজ' হইতে ১৯০৮ সালে বি. এ. পাশ করেন) শিক্ষা তিনি সম্যক গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মানস-প্রকৃতির উন্মেষে ও সাহিত্যিক সাধন-পন্থার নির্দ্দেশে তাঁহার পিতার চরিত্র ও তন্নিহিত আদর্শ, এবং পিতারই কবি-স্বভাব ও কাব্য-প্রীতি প্রকৃত সহায় হইয়াছে—সে বিষয়ে পিতাই তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু। বাংলা সাহিত্যের সেবায় মোহিতলালের যদি কিছুমাত্র অধিকার জন্মিয়া থাকে, তবে তাঁহার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পিতার নিকট ঋণী। [মোহিত-লালের কবিখ্যাতি সাহিত্য সমাজেই সীমাবদ্ধ—সেখানেও তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। তাঁহার কবিতার ভাব ও ভাষা এমনই গুরু ও গম্ভীর যে, তরলমতি তরুণ, অথবা সৌখীনহৃদয় বৃদ্ধ, কাহারও পক্ষেই তাহা সুখ-সেব্য নহে। তৎসত্ত্বেও, আধুনিক কবিগণের মধ্যে তাঁহাকে একটা

স্থান দেওয়া চাই, নহিলে নাকি অন্যায় হইবে]

মোহিতলাল এই পর্য্যন্ত এই কয়খানি কাব্যপ্রকাশ করিয়াছেন—'স্বপন পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মর-গরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলী'।"

বি-এ পাশ করিয়াই তাঁহাকে সংসারের আবর্ত্তে পড়িতে হয়। ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ এবং আইন পড়িতে আরম্ভ করেন কিন্তু সাংসারিক প্রয়োজনে তাঁহাকে পড়া ছাড়িয়া একটি হাই-স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষা দিবার বাসনা তাঁহার বহুদিন ছিল; এই সময়কার কৃতী ও অসাধারণ মেধাবী ছাত্র সুশীলকুমার দের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয় এবং ইহার ফলে তাঁহার ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে বিশেষ অধিকার জন্মে এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যিক জীবনে ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের বৎসর মোহিতলাল অস্থায়ীভাবে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। প্রায় বৎসর তিনেক সেট্‌লমেণ্ট কানন্‌গোর কাজ তিনি করেন। তাঁহার কবি-মন এই কাজের উপযোগী ছিল না। কিছুকাল পরে ঐ কাজ ছাড়িয়া পুনরায় তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এই সময় হইতে আবার তাঁহার কবি-জীবন আরম্ভ হয়। 'মানসী', 'ভারতী' প্রভৃতি তদানীন্তন বিখ্যাত সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩২৮ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত হয়।

ইহার প্রায় বৎসর তিনেক পরে ১৩৩১ সালে প্রবাসী-সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালিত শনি-চক্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। ক্রমে তিনি এই চক্রের প্রধান নেতা হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

১৩৩৩ সালের শ্রীপঞ্চমী দিবসে 'প্রবাসী' কার্য্যালয় হইতে তাঁহার অবিস্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হয়। 'শনিবারের চিঠি'তে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিশেষ আন্দোলন ও তাহার গতি-প্রকৃতি এবং সাহিত্য-সাধকগণের পরিচয় তিনি লিখিতে থাকেন। ফলে, যে সকল ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী বৈদেশিক সাহিত্যের মোহে এতকাল আচ্ছন্ন ছিলেন তাঁহারাও অনেকেই বাঙালা সাহিত্য-সম্বন্ধে কৌতূহলী হইলেন।

১৩৩১ সালে প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক মোহিতলাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের একজন অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নিয়োগে প্রথম-প্রথম নানারূপ অপ্রীতিকর আলোচনা এবং অধ্যাপক সুশীল কুমার দের বন্ধুপ্রীতির কথা শুনা গিয়াছিল ; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই মোহিতলাল ছাত্র-সমাজে এবং সাহিত্যিক মহলে তাঁহার নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৩৪৩ সালের শ্রাবণ মাসে ঢাকার 'আলবার্ট লাইব্রেরী' হইতে তাঁহার প্রথম সাহিত্য-প্রবন্ধপুস্তক 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরই অগ্রহায়ণ মাসে 'রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস' হইতে সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার তৃতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'স্মর-গরল' প্রকাশ করেন।

ঢাকার ছাত্রেরা শিক্ষক মোহিতলালকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন। অধ্যাপক গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁহারা মোহিতলালের বিরুদ্ধ-সমালোচক ছিলেন ক্রমে অনেকেই তাঁহাব বন্ধুত্ব পরম গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার অন্যতম কৃতী ছাত্র অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগী বলেন : "অধ্যাপনা যে ধ্যান-কর্ম হ'তে পারে অধ্যাপনাকেও যে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করা চলে, এই প্রথম গুরুদেবের কাছ থেকে উপলব্ধি করলাম।" (আচার্য্য মোহিতলাল—'শনিবারের চিঠি', ভাদ্র, ১৩৫৯)

ঢাকায় অধ্যাপনাকালে এই অধ্যাপক-কবি রমনার রমণীয় নির্জ্জন প্রান্তে 'নীলক্ষেত' পল্লীতে বাস করিতেন। ঢাকায় আসিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিবার কিছুকাল পরেই তিনি এই বাড়ীতে একটি চমৎকার পুষ্পোদ্যান রচনা করেন। পড়াশুনার বাহিরে যে সময়টুকু পাইতেন সবই তিনি এই ফুলবাগান তৈয়ারী করিতে ব্যয় করিতেন। নানা রংয়ের নানা জাতের গোলাপ তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং গোলাপের ফলন-বিষয়ে তাঁহার স্বকীয় গবেষণাও যথেষ্ট ছিল। শতাধিক প্রকারের গোলাপ তিনি এই বাগানে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ঢাকায় তাঁহার এই বাগান একটি দেখিবার বস্তু ছিল। তাঁহার স্বল্প আয়ের অধিকাংশই তিনি গ্রন্থ ও গোলাপে ব্যয় করিতেন ; অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহা হইতে কোন প্রকারে বৃহৎ পরিবারের ও সাহিত্যিক মজলিসের ব্যয় সঙ্কুলান হইত,—উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকিত না। ফলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আসার পর তাঁহার ‘ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স’ বলিতে অতি সামান্যই ছিল।

“সাহিত্য-বিষয়ে আলাপ আরম্ভ হইলে, তিনি সময়ের এবং কাণ্ডজ্ঞানের মাত্রা হারাইয়া বসেন। ইহার জন্যে তাঁহার সংসারে যে কি পরিমাণ অসুবিধা ঘটে, তাহা তিনি কখনও ভাবিয়া দেখেন না। বৈকালে আলাপ শুরু হইল, তাঁহার উত্তেজনা ও কণ্ঠ উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল তিনি অনর্গল সাহিত্যের রীতি-নীতি দুর্নীতি-অনাচার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। সুতরাং বৈকাল সন্ধ্যায় গড়াইল, সন্ধ্যা নিশীথ রাত্রিতে পর্য্যবসিত হইল, অন্তঃপুর চা ও পাঁপড় ভাজা ও আনুষঙ্গিক খাবার বিনা নোটিশে সরবরাহ করিতে বাধ্য রহিলেন, এমনই প্রায় প্রত্যহ।” (‘শনিবারের চিঠি’, মাঘ, ১৩৪৬) সুতরাং তাঁহার আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সবিশেষ ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় সমালোচনা-সাহিত্যের অভাব তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন। ‘ইংরেজীর মত উৎকৃষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ এবং সাহিত্যের নানাবিধ ইতিহাস যতদিন সুলভ না হইতেছে, ততদিন ছাত্রগণকে ঐরূপ পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া তোলা দুষ্কর।’ এইরূপ মন্তব্য তিনি প্রায়ই করিতেন। পরে কবিতা লেখা একরূপ ছাড়িয়া দিলেন এবং সাহিত্যের আদর্শ, রূপ ও রীতি সম্বন্ধে আলোচনা ও সাহিত্য বিচার বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহু পরিশ্রম করিয়া তিনি এই সকল গ্রন্থ রচনা করিলেন; কিন্তু বাংলাদেশে এই ধরনের বইয়ের বিক্রয় সীমাবদ্ধ; সুতরাং গ্রন্থকারের আর্থিক লাভও সীমিত।

মোহিতলালের জীবনের শেষ দিনগুলি অতিশয় অসচ্ছলতার ভিতর দিয়াই অতিবাহিত হইয়াছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি সাংসারিক খরচ চালাইতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি রক্তের চাপ-বৃদ্ধি (High blood pressure) রোগে এবং হাঁপানি-কাশিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। ইহার ভিতরেও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাকে অক্লান্তভাবে লেখনী-চালনা করিতে হইয়াছে।

দারিদ্র্যদোষ গুণরাশি নাশ করে; কিন্তু নিদারুণ দারিদ্র্য-জ্বালা তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছেন। অথচ তাঁহার অতুলনীয় গুণরাশির একটিও নষ্ট হয় নাই। কাহারও কাছে হাত পাতা তো দূরের কথা তাঁহার প্রাপ্য টাকা পর্য্যন্ত

তিনি চাহিতেন না। এমন নির্লোভ লোক সচরাচর দেখা যায় না। দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেও নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কাহারও নিকট তিনি মস্তক অবনত করেন নাই।

কাল ব্যাধি ক্রমশঃ তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। বড়িশার বাস-ভবনে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে না ভাবিয়া কয়েকজন অনুরাগী বন্ধু এবং জনকয়েক ভক্ত ও সেবাপরায়ণ ছাত্র তাঁহাকে ১৯৫২ সালের ২২শে জুলাই কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে লইয়া আসিলেন। এখানে সুচিকিৎসকগণ প্রাণপণে তাঁহার রোগমুক্তির জন্যে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল যত্ন ও সকল ঔষধই বিফলে গেল। তাঁহারা মোহিতলালের জীবনরক্ষা করিতে পারিলেন না। ২৬শে জুলাই, শনিবার রাত্রি নয়টা পনেরো মিনিটের সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সারাজীবন মোহিতলাল সত্য ও সুন্দরের উপাসনাই করিয়াছিলেন। তাঁহার ‘সত্যসুন্দর দাস’ এই ছদ্ম নাম গ্রহণের সার্থকতা এখন আমরা বুঝিতে পারি। (সংকলিত)

[শ্রীআজাহার উদ্দীন খানের “বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল” ও শ্রীহরনাথ পাল রচিত “কবি মোহিতলাল” গ্রন্থে কৌতূহলী পাঠক মোহিতলালের জীবনী ও সাহিত্য-সাধনার বিস্তৃত আলোচনা পাইবেন। এই দুই গ্রন্থকারের নিকট বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রই অশেষ ঋণে আবদ্ধ।]

পাঠক্রম

স্মরণ

কাল রাত্রি পোহাইল ?—পূর্ব্বাভাস অসীম উষার
দেখা যায় প্রাচী-প্রান্তে ! মুমূর্ষু এ জাতির শিয়রে
জেগে বসেছিল যেই, মহামন্ত্র সে কর্ণকুহরে
উচ্চারিয়া বার বার—সে যে তুমি, হে চিরকুমার !
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-বীর, উদাসীন—প্রেমিক উদার,
ইহ-পরত্রের বন্ধু, রথিশ্রেষ্ঠ সঙ্কট-সমরে—
হে সংযমী, যমভয়-ভীত জনে অন্তিম প্রহরে
দানিলে অভয়-দীক্ষা, ব্রহ্মবিদ্ ! চরিত্রে তোমার।

তোমারে স্মরণ করি, স্মরে যথা তীর্থশেষে ফিরি'
আপনার গৃহকোণে দীন গৃহী দূর গিরি-চূড়া—
দেবতা নিবসে যথা—চন্দ্রমৌলী, তুষার-ধবল !
পাদমূলে বহে বারি পিপাসার, শির রহে ঘিরি'
চিরস্তব্ধ তারা স্তোম, বক্ষে তার বজ্র হয় গুঁড়া !
জানে আর হেরিবে না, জানে তবু—সে গিরি অচল !

মানুষ-পূজা

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বাংলা দেশেই ভারতের সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার বিষম সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর মনে একদিকে যেমন দেশের ও জাতির অতীত গৌরব ও ভারতীয়-সাধনা সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ জাগিয়াছিল, তেমনই বাঙালীর মনীষা য়ুরোপের অভিনব বৈজ্ঞানিক মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুগে ইংরেজী-শিক্ষার প্রভাবে বাঙালীর হৃদয় ও মস্তিষ্ক যে ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল এমন বোধ হয় পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের যে দুই বিভিন্ন প্রকৃতি, সেই দুইয়ের মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী বিরোধ, সেই বিরোধের ক্ষেত্র হইল বাঙালীর মন, বিধাতা সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। বাঙালী জাতি স্বভাবতই ভাবপ্রবণ, জ্ঞানের পরিবর্ত্তে প্রেম ও ভক্তি তাহাকে মাতাইয়া তোলে; এবার সেই প্রেম ও ভক্তির পথে বড়ই বিঘ্ন ঘটিল। য়ুরোপ যে পথে চলিয়া শেষে একটা মহাগহ্বরের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমাদের দেশেও সেই পথের সেই মহাগহ্বর দেখা দিল। য়ুরোপ মানুষের জীবন ও সেই জীবনের প্রত্যক্ষ নিয়তিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই; সেখানে প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রামে মানুষের কর্ম্মশক্তি যেমন দুর্জ্জয় হইয়া উঠে তেমনই তাহার প্রবৃত্তিও দুর্ব্বার অর্থাৎ দেহচেতনা অতিশয় প্রখর হইয়াছে। এইজন্য য়ুরোপ এই জীবন ও জীবনের সুখ-দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া আত্মার মুক্তি বা আনন্দের সাধনায় মনকে ভগবৎ-মুখী করিতে পারে নাই, এই মর্ত্ত্যজীবন তাহার কাছে আরও বড় হইয়া উঠিয়াছে; অথচ মৃত্যুকেও জয় করা যায় না। এই সমস্যার সমাধানে

সে দেশের জ্ঞানী মনীষীরা প্রকৃতির বা সাক্ষাৎ সৃষ্টি-বিধানের নিয়মকেই একমাত্র সত্যধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন,—মৃত্যুকে, দুঃখকে ঐ প্রাকৃতিক নিয়মে যতটা নিবারণ করা যায় তাহাই পরম পুরুষার্থ, ইহার অধিক আশা করাই অন্যায়। জীবনের পরে কিছুই নাই—মিথ্যা কল্পনায় মনকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিলে, নিজের প্রতি এবং মানুষের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করা হইবে। এই ভাবনা হইতে একটা বড় লাভ হইয়াছিল—মানুষ ভগবানের দিকে না তাকাইয়া নিজেরই পুরুষকারকে একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্থির করিল এবং সেই পুরুষকারের বলে, যতটুকু সাধ্য নিজের জীবন সফল করিবার আশায় প্রাণ-মনের সকল শক্তিকে সেই সাধনায় নিয়োজিত করিতে চাহিল। কিন্তু জীবনের পরে আর কিছু নাই—মৃত্যুই শেষ, এ চিন্তা মানুষকে কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পারে না। তাই এই বৈজ্ঞানিক জীবনবাদ ক্রমে একটা ঘোর নাস্তিকতা, এবং তাহার ফলে একটা ঘোরতর ইহকালসর্ব্বস্ব ভাবে পরিণত হইল। মানুষ যদি সত্য হয় তবে ভগবান মিথ্যা; দেহধর্ম্ম যদি সত্য হয় তবে আত্মার ভাবনা মিথ্যা;—দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি-সাধনের কোন উপায় না দেখিয়া য়ুরোপ প্রত্যক্ষ-দর্শনের উপরেই মানুষের ধর্ম্মকে নূতন করিয়া স্থাপন করিতে চাহিল। বিষই হউক আর অমৃতই হউক—যাহা আছে তাহার অধিক চাহিও না, জীবনকে যতদূর সাধ্য ভোগ করিয়া চিরমৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

আমাদের দেশেও এই তত্ত্ব প্রচারলাভ করিতে লাগিল। জ্ঞানে, চরিত্রে ও প্রাণশক্তিতে যাহারা শ্রেষ্ঠ তেমন মানুষকেও নাস্তিক হইয়া যাইতে দেখা গেল। ঐ বিজ্ঞানের ঐরূপ সাধনা আমাদের দেশে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই; বহিঃসৃষ্টির রহস্য, প্রকৃতির নিয়তি-নিয়ম, ও তাহারই

সূত্র ধরিয়া মানুষের দেহ-জীবনের অন্তস্তল এমন করিয়া উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা আমরা কখনও করি নাই। এ বিদ্যা এমন একটা সত্যকে আর সকল সত্যের উপর তুলিয়া ধরিল যে, ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যা তাহার আকস্মিক আঘাতে যেন টলিতে শুরু করিল।

এই যে নূতন নাস্তিক্যবাদ বা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ—ইহার সহিত সত্যকার যুদ্ধ বাধিল এই ভারতবর্ষে হিন্দুর অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে, এবং এইখানেই তাহার চরম মীমাংসা হইয়া গেল। আর সকল দেশে ঈশ্বর, ভগবান, স্বর্গ, পরলোক প্রভৃতির যে তত্ত্ব—তাহা প্রধানতঃ ভক্তি বা বিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে তত্ত্ব ব্রহ্ম ও জগৎকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে,—মানুষ ও ঈশ্বরে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কিন্তু ভারতের ব্রহ্মবাদ পরাজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—ভক্তিই বরং বহু পরে ক্রমে সেই জ্ঞানের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে, ভারতের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসায় কোন প্রশ্নই অমীমাংসিত থাকিতে পারে নাই, কোনখানে অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় লওয়া প্রয়োজন হয় নাই। এখানে ভক্তিও পরাজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং জ্ঞানও শুধুই জ্ঞান মাত্র নয়—মানুষের চরিত্রে, তাহার সকল ভাবনা-চিন্তায় ও কর্ম্মে, সেই জ্ঞান পূর্ণ-বিকশিত হওয়া চাই; এখানে বিদ্বান ও জ্ঞানী এই দুই শব্দ এক নয়। মানুষ তাহার সমগ্র সত্তা দিয়া সেই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিলে পর—তাহার সর্ব্ববিধ কর্ম্মে ও ব্যবহারে সেই লক্ষণ পরিস্ফুট হইলে পর—তবে তাহাকে জ্ঞানী বলা যাইতে পারে। তাই য়ুরোপ যে নূতন জ্ঞানের তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়া ভারতীয় সাধনার মূলোচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল তাহাতে প্রাণে একটা ধাক্কা লাগিলেও—এ দেশের ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত শক্তিমান মনীষীর বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিলেও—শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইল।

তাহার আত্মায় সে আঘাত পৌঁছিল—সেই আত্মাই একজন নিরক্ষর বাঙালী ব্রাহ্মণ-সন্তানের মধ্যে আপন সত্য-স্বরূপে প্রকাশ পাইল, এবং সেই আত্মঘাতী নাস্তিক্যবাদের বিজয়-অভিযানকে প্রতিহত করিল। যুরোপ দেহের ক্ষেত্রে এখনও জয়ী—সারা পৃথিবীর উপরে সে আধিপত্য করিতেছে; শুধু দেহের উপরে নয়, মনের উপরেও; এবং আত্মাকেও সে প্রায় ধূলিসাৎ করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভারতের এক অতি অবজ্ঞাত কীর্ত্তিহীন বিত্তহীন শক্তিহীন জাতির মধ্যে সে তাহার বিদ্যার দম্ভ প্রচার করিতে গিয়া ভারতের সেই প্রাচীন বাণীকেই বালুকাতল হইতে সরস্বতীর মত উৎসারিত করিয়া দিল। শুধু রাজধানী নয়—নবযুগের নূতন ভাবধারার উৎসরূপে যে মহানগরী সারা ভারতকে শাসন করিতেছিল, যে নগরী পাশ্চাত্য গুরুগণের গুরুকুলরূপে আর সকল শিক্ষায়তনকে হতমান করিয়াছিল—হিন্দুর বারাণসীকেও তীর্থ-মহিমায় পরাস্ত করিতে চলিয়াছিল—তাহারই উপকণ্ঠে, সেই জ্ঞানের দম্ভ ও ঐশ্বর্য্যের মদমত্ততাকে যেন পরিহাস করিয়া, পাশ্চাত্য আদর্শের নিকটে আত্মবিক্রীত অথচ স্বাতন্ত্র্যগর্ব্বিত সমাজের উপেক্ষায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া—এক বিদ্যাহীন কুলমানহীন দুর্ব্বল অসহায় ভিখারী মানবাত্মার অপরাজেয় শক্তিকে চক্ষুগোচর করাইল—মৃত্যুকে জয় করিবার নূতন পথ দেখাইল, মানুষকে দেবত্বের আশ্বাস দিল, অমৃত-নিস্যন্দী কণ্ঠে পরমানন্দের গান গাহিল।

হিন্দু আমরা অবতারবাদে বিশ্বাস করি। অবতার অর্থে আমি কি বুঝি তাহা পরে বলিব। কিন্তু অবতারতত্ত্ব যাহাই হউক, হিন্দু আর একটা কথা বলিয়া থাকে। সেই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও কি অর্থে সত্য তাহাই বলিব। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, কারণ কাল সর্ব্বজয়ী,—এক

যুগে যাহা সত্য অন্য যুগে তাহাই সত্য নয়। ইংরেজ কবির সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করুন—

"Old order changeth yielding place to new,
And God fulfils Himself in many ways."

—এ কথা একজন অহিন্দুর উক্তি, তথাপি হিন্দু ভিন্ন আর কোন সমাজ ইহা মানে না। আমরা সনাতনকে মানি বলিয়াই যুগকেও মানি —কালের ধারায় সেই এক সনাতনকেই বহু রূপ ধারণ করিতে হয়, তাহার জন্য সনাতন মিথ্যা হইয়া যায় না। যে দেশে যাজ্ঞবল্ক্য, গীতাকার, বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য জন্মিয়াছেন, সে দেশে যে আবার নূতন করিয়া সনাতনকে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই তাহার জ্বলন্ত-সাক্ষ্য। এ যুগের যে সমস্যা, সে সমস্যা শুধুই কোন এক দেশের এক সমাজের সমস্যা নয়, সারা জগতের সমস্যা; সেই সমস্যা ইতিপূর্ব্বে ভারতের কোন যুগে এমন ভাবে সমাধান দাবি করে নাই। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এ যুগে পশ্চিম ভূখণ্ডের মনুষ্যসমাজই সর্ব্বাপেক্ষা জীবিত বা জীবন্ত, প্রাচ্য প্রায় মুমূর্ষু; এই অতি জীবন্ত সমাজই জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা তুলিয়াছে তাহারই বিষবাষ্পে সমগ্র জগৎ মূর্চ্ছিতপ্রায়। এবার সেই পাশ্চাত্যের মানুষই বেতাল বা ব্রহ্মপিশাচের মত এমন এক দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে—যাহার উত্তর দিতে না পারিলে মানুষের আর রক্ষা নাই। সে প্রশ্ন এই—মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য কি? মানুষ অর্থে দেহধারী জীব—আত্মা নয়। মানুষ হিসাবেই মানুষের জীবনের কোন সদর্থ আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষ দেন নাই। ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবানের ভয় দেখাইয়া কোথাও মানুষকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে,

কোথাও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বা অনুগ্রহস্বরূপ মানুষকে ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা মৃত্যুর পরে পুরস্কারের আশা দিয়া মানুষকে দুঃখ বরণ করিতে বলা হইয়াছে। জগৎ যে একটা বন্দীশালা, মানুষের জীবনে যে সত্যকার স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা নাই—মানুষ যে বড় দুর্ব্বল, দুর্গতি যে তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে, এবং তাহা ভুলিবার একমাত্র উপায় চিত্তকে জগৎ-মুখী না করিয়া ভগবৎ-মুখী করা—আমাদের দেশেও শেষে ইহাই হইয়াছিল জীবন-সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা। এ দেশেও ঐতিহাসিক কালে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মানবগুরুগণ যে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই জগৎকে তেমন মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই, এই মনুষ্য-জীবনের কোন স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য স্বীকার করা হয় নাই। ইহাও সেই উপদেশের দোষ বা অপূর্ণতা নয়, যে যুগে যে সমস্যা প্রধান হইয়া উঠে, যুগাবতারগণ সেই সমস্যারই সমাধান করেন। মানুষের আত্মা ও তাহার প্রকৃত স্বরূপ, ব্রহ্ম ও সৃষ্টি—এ সকলের যে তত্ত্ব তাহাই সনাতন; ভারতবর্ষ তাহাকে যে রূপে দর্শন করিয়াছে ও তদনুযায়ী সাধনার যে মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহাতে যে কোন গুরুতর অসঙ্গতি আছে, এ পর্য্যন্ত কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু সে অভিযোগ করিতে পারেন নাই। আবার, প্রতি যুগের সমস্যা-সমাধানে, অর্থাৎ মানুষের যুগোচিত পিপাসানিবারণে, সেই যুগাবতার মহাপুরুষগণ যে নূতনতর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অভিনব হইলেও সেই সনাতন মূলতত্ত্বের বিরোধী হয় নাই। কিন্তু এ যুগের এই সমস্যা যে কারণে যেরূপ দুরূহ, এবং সর্ব্ব-সমাজের মানবমণ্ডলীর পক্ষে একই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন আর কখনও হয় নাই। মানুষকে ছোট করিলে চলিবে না, ভগবান বা ব্রহ্মকে সকল মূল্য দিয়া সেই ব্রহ্মকে

অতি ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া মানুষকে তাহার বেদীমূলে উৎসর্গ করা চলিবে না। মানুষের মূল্যও প্রমাণ করা চাই। ঠিক এই কাজ পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই—কারণ, সে প্রয়োজন হয় নাই—মানুষের মনে তাহার নিজ জীবনের মূল্যবোধ এমন করিয়া পূর্ব্বে জাগে নাই।

এ পর্য্যন্ত খাঁটি অধ্যাত্মবাদ যেমন মানুষের আত্মাকেই প্রাধান্য দিয়াছিল—তেমনই আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদ বা জড়-সৃষ্টির অন্ধ-শক্তিবাদ সেই আত্মাকে অস্বীকার করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মতত্ত্ব মানুষের জীবনকে জন্ম ও মৃত্যুর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধিয়া, এক দিকে তাহাকে যেমন অতিশয় অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করিয়াছে, তেমনই অপর দিকে ব্যক্তি-সুখসাধনকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে—একটা বণিক-সুলভ হিসাববুদ্ধিকেই বড় করিয়া তুলিয়াছে। এই বণিক-বুদ্ধিমতে, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা ও মনুষ্যসমাজে তাহা সমভাবে বণ্টন করিয়া প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ-সাধন। সেই ভোগের মূলে হিসাববুদ্ধি-বর্জ্জিত কোন ত্যাগের প্রেরণা নাই, সে কল্যাণের মূলে কোন বৃহত্তর সত্য নাই। মানুষের স্বতন্ত্র মহিমা ও মনুষ্যজীবনের মূল্য-বোধ—যাহা এই যুগেরই প্রধান প্রেরণা, তাহা মানুষকে বলীয়ান মহীয়ান না করিয়া আরও ক্ষুদ্র আরও আশাহীন করিয়াছে। অতএব বেতালের সেই প্রশ্ন—পাশ্চাত্য সমাজের মানুষই কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত যাহা উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছে—সে প্রশ্নের উত্তর সে নিজে দিতে পারে নাই, না পারিয়া আপনার বিষে আপনি জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে এই ভারতবর্ষ—যে ভারতবর্ষ আত্মব্রহ্মতত্ত্বে একের উপলব্ধি করিয়াছিল, যে ভারত ব্রহ্মকে মহতো-মহীয়ান

জানিয়াই মানুষের মধ্যে তাঁহার অবতরণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, যে ভারত গুরুবাদ ও অবতারবাদের তত্ত্বকে এমন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল যে, মানুষের দেহে পরম পুরুষের অধিষ্ঠানকে কিছুমাত্র অসঙ্গত মনে করে নাই, যে ভারত মানুষকে ভগবানের সামনে বসাইয়া পূজা করিবার কালে ভগবানের মহিমা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই—অথচ মানুষ যে কত বড়, মানুষের নিজের নিকটে নিজের মূল্য যে সর্ব্বাধিক, এবং সেইজন্যই পরও আত্মবৎ মূল্যবান, এই পরম তত্ত্বটিকে কখনও বিস্মৃত হয় নাই। এ যুগে সেই তত্ত্বটিকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, মানুষকে মানুষরূপে ভগবানের আসনে বসাইয়া তাহার মহিমা প্রত্যক্ষগোচর করাইবার জন্য এক মানুষের দেহে সেই তত্ত্ব মূর্ত্তিধারণ করিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই তত্ত্বেরই অবতার বা শরীরী মূর্ত্তি—আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাই বুঝিয়াছি—সেই কথাটি বলিবার জন্যই এতক্ষণ এই সুদীর্ঘ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছি। বুদ্ধ তত্ত্বকেই বড় করিয়াছিলেন—মানুষকে নয়; শঙ্করও ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্য ভগবদ্ভক্তিকেই নিজ দেহে রূপ দিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের মহিমাকেই নিজ দেহে প্রকটিত করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরের সেই ছোট ঘরখানির বারান্দায় সেই যে পুরুষ আমাদের মানস-চক্ষে যুগ যুগ ধরিয়া উপবিষ্ট আছেন—একখানি ছোট ধুতি পরা, কোঁচার প্রান্তটুকুই অঙ্গের উত্তরীয় হইয়াছে, তাঁহার কোন বৈভব নাই, কোন অভিমান নাই, এমন কি, দেহকান্তিও নাই, বাহিরের কোন গৌরবই নাই—আছে কেবল অবিমিশ্র মনুষ্যত্ব। সে মনুষ্যত্ব বুঝিতে হইলে নিজেও ক্ষণিকের জন্য খাঁটি ও পূরা মানুষ হইতে হইবে। সে পুরুষ নিজেও অতি সাধারণ

মানুষের মত হইয়া—সন্ন্যাসী, আচার্য্য বা গুরুর বেশে নয়—প্রতিবেশী গৃহস্থের বেশে, মানুষের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনার ভাগী হইয়া, এমন কি স্বাভাবিক দেহ-দশার সকল কষ্ট সহ্য করিয়া, মানুষের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়াছিলেন! অথচ সেই পুরুষের নিকট বসিলে মনে হইত যেন উপরে স্বচ্ছ নীল উদার আকাশ মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে, যেন মাটির দীপটিতেই নক্ষত্রের আলো জ্বলিতেছে। এ পরম-পুরুষ নয়—পরম-মানুষ, দিব্য-মানুষ! আয়নায় নিজ মুখছবি যে কখনও দেখে নাই, সে যেমন হঠাৎ তাহা দেখিলে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া থাকে—চিনিতে বিলম্ব হয়, পরমহংসদেবকে দেখিয়া মানুষ তেমনই বিস্মিত হইয়াছিল—সহসা চিনিতে পারে নাই, কারণ, মানুষ যে কখনও আপনাকে আপনি ভাল করিয়া দেখে নাই!

এবার ভারতীয় ঋষির ধ্যানলব্ধ সেই আত্মা মানব ইতিহাসের এই যুগ-সন্ধিক্ষণেই মানুষরূপেই অবতীর্ণ হইলেন, শুধু ভারতের জন্য নয়, জগতের জন্য। জগৎ এখন মানুষকেই পূর্ণ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। এবার ব্যক্তির মুক্তি-কামনা নয়, সমগ্র মানবের জীবন্মুক্তি—অর্থাৎ পরকালে নয়, ইহকালেই তাহার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ-সাধন হইল পরম পুরুষার্থ। সে কল্যাণের পন্থা কি? ভগবৎ-প্রেমকে মনুষ্যপ্রেমে প্রবাহিত করা—স্বর্গে মুক্তিসুখ না চাহিয়া মর্ত্ত্যেই প্রজ্ঞাবান, বলবান ও নির্ভয় হইয়া বিচরণ করা; গিরিগুহায় বসিয়া ব্রহ্মের ধ্যান না করিয়া—প্রত্যক্ষ ব্রহ্মময় যে জগৎ তাহাকেই শুচি ও সুমার্জ্জিত করিয়া, ব্রহ্মকে তাহার মধ্যেই কর্ম্মের দ্বারা সুগোচর ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা। জীবই শিব, দয়ার অধিকারী কৃপার জীব সে নয়—শ্রদ্ধার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা তাহার সেই শিবত্বের উদ্বোধন কর; আপনার মুক্তিচিন্তা ভুলিয়া, পরকালের কথা

ভুলিয়া, আর সকল তত্ত্ব ভুলিয়া—মানুষের পূজা কর, দেখিবে সকল দুর্ব্বলতা দূর হইয়াছে ; মৃত্যুভয় থাকিবে না—পরম জ্ঞান, পরম শক্তি, পরমানন্দের অধিকারী হইবে। যতদিন এই সংসার ও এই মানুষের প্রতি বিমুখ হইয়া আত্মসাধনায় মগ্ন থাকিবে ততদিন মহাভয়ের দাস হইয়া থাকিবে : ততদিন প্রকৃত আত্মদর্শন হইবে না। যে জড়প্রকৃতির নিয়মকে মানুষেরও নিয়তি বলিয়া বিশ্বাস করে, সেও যেমন মানুষকে অশ্রদ্ধা করিয়া আপনি অমানুষ হয়, তেমনই, যে জগৎ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক করিয়া আপনার সহিত সেই ব্রহ্মের যোগসাধনে তৎপর হয় সেও তেমনই আত্মহত্যা করে, সেও নাস্তিক। আত্মাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় —পরের মধ্যে তাহাকে প্রত্যক্ষ করার সাধনা। কাঠ, পাথর বা মাটির মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সাধক যে উপাসনা করে তাহাও যেমন ভ্রান্ত, মনের নিভৃত মন্দিরে ধ্যানকল্পনার সাহায্যে যে ব্রহ্মদর্শনের সাধনা তাহাও তেমনই অসম্পূর্ণ, স্বচ্ছ শীতল জলরাশিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াও যে পিপাসানিবৃত্তির জন্য আকাশের পানে চাহিয়া থাকে, সে হয় উন্মাদ, নয় তাহার পিপাসা সত্য নয়।

এই যে মানবসেবা বা মানবপূজা ইহাও ভারতীয় ব্রহ্মবাদের সেই মূল তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেই তত্ত্বকে যুক্তি-তর্কের বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে হয় না, হয়তো করাও যায় না। পণ্ডিতের সভায় যাহা তত্ত্বের আকারে অতি সূক্ষ্ম ও জটিল হইয়া উঠে—মানুষের প্রাণে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অতি সহজ উপলব্ধি ঘটে। এতদিন তত্ত্বের গভীরতায়, অধ্যাত্মবিদ্যার অতি জটিল তর্কজালে, এই পরম সত্য আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তাই মানুষের জীবনে তাহা প্রকট হইয়া উঠে নাই। এবার এই পরম জ্ঞান বা পরম উপলব্ধি সকল

পাণ্ডিত্যের, সকল যুক্তিতর্কের শাসন হইতে মুক্ত হইয়া এক নিরক্ষর পুরুষের বাণীতে পূর্ণ-প্রকাশ পাইল। গীতাকার, বুদ্ধ, শঙ্কর সকলেই যাহা বলিয়াছিলেন এবার তাহা তত্ত্ব না হইয়া তথ্য হইয়া দেখা দিল। তাহার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি—এবার জগৎ ব্যাপিয়া যজ্ঞের আগুন জ্বলিতেছে, এতকাল যাহার সাধনা ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন তাহা সত্যই সমগ্র জগতের সঙ্কটনিবারণের জন্য অত্যাবশ্যক হইয়াছে। এবার কেবল তত্ত্ব-উপদেশ নয় অথবা ব্যক্তি-জীবনে সেই উপদেশের ফল-পরীক্ষা নয়—এবার জগৎ-যজ্ঞশালায় ব্রহ্মাগ্নিতে মানব-রূপী ব্রহ্মকে ব্রহ্মহবি আহুতি দিতে হইবে। এবারে শুধু জ্ঞানে মুক্তি নয়, শুধু ভক্তিতেও নয়, এবার কর্ম্মই মুখ্য। এবার কোথাও তপোবনের শান্তি নাই, নিভৃত-নির্জ্জন গুহা নাই—দিগন্তগ্রাসী মহাপ্লাবন আসিয়াছে; সেই প্লাবনে শুধু আপনার তরীখানি নয়—জগৎ-মহাতরীর হাল ধরিতে হইবে, মানুষের সহিত মিলিতে হইবে। সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বমানবের কল্যাণ ভিন্ন নিজেরও কল্যাণ নাই। পাশ্চাত্যের মানুষ ভাবিয়াছিল জড়শক্তির উপাসনা করিয়া, ব্যক্তি-মন্ত্রের সাধনা করিয়া এই মহা সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইবে। মানুষকে সে যন্ত্র মনে করিয়াছিল, এবং জ্ঞানের অহঙ্কারে সে এই যন্ত্রগুলিকে একটা বৃহত্তর যন্ত্রের অঙ্গীভূত করিয়া সমষ্টির কল্যাণ-সাধন করিবে এই অভিমান করিয়াছিল। মাযনুকে ছোট করিয়া মানুষের কল্যাণ করা যায় না, সে কল্যাণের যেমন অর্থ নাই, তেমনই সে কল্যাণ সাধনার পক্ষে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি ওই নাস্তিক্যবাদ মানুষের প্রাণে সঞ্চার করিতে পারে না। সকল কর্ম্মের অগ্রভাগে ব্রহ্মকে স্থাপন না করিলে কর্ম্মের কোন উদ্দেশ্যই থাকে না—ভিত্তিস্থাপন না করিয়া চূড়ায় উঠিবে কি করিয়া? সর্ব্বমানবের মধ্যে সেই একক না দেখিলে

সর্ব্বাত্মীয়তা-বোধ হইবে কেমন করিয়া? সেই আত্মীয়তা-বোধ না জন্মিলে সত্যকার কল্যাণ-কামনা জাগিবে কেমন করিয়া? মানুষ যে জীবমাত্র নয়—মানুষই যে শিব, এ প্রত্যয় না হইলে কোন কর্ম্মের অর্থ নাই, কল্যাণের কোন মূল্যই থাকে না।

এই বাণীই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। এ বাণীকে প্রথমে বুঝিয়া পরে কর্ম্মে প্রয়োগ করিতে হয় না—ইহা জীবনেই জীবন্ত হইয়া উঠে—কর্ম্মের ভিতর দিয়াই ইহার উপলব্ধি হয়। ঠিক এই তত্ত্বই গীতাকার উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মর্ম্ম তখন মানব-গোষ্ঠীর আত্যন্তিক প্রয়োজনে এমন সত্য হইয়া উঠে নাই; তাহার ভাষাও শাস্ত্রের ভাষা হইয়াছিল; এতকাল পরে সেই বাণী পুঁথি হইতে বাহির হইয়া মানুষের মূর্ত্তিতে দেখা দিল। এ বাণী পুঁথির তত্ত্ব নয়, জীবনের সত্য—ইহা অধ্যাত্ম-সাধনার তত্ত্ব নয়—মনুষ্যত্ব-সাধনার মন্ত্র। এ সাধনায় মানুষকে বসাইতে হয় দেবতার স্থানে, সেই দেবতার সেবার দ্বারাই নিজেও দেবতা হওয়া যায়, এবং তাহাতেই—একদিকে যেমন জগতের হিতসাধন, অপর দিকে তেমনই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' চেতনার উন্মেষ হয়। এই বাণী নূতন নয়—অতি পুরাতন বটে, কিন্তু মানুষকে—মানুষের মর্ত্ত্য-জীবনের ইষ্টসাধনাকে—সেই সনাতন তত্ত্বের অনুগত করিয়া এতবড় গৌরবের আসন এমন ভাবে আর কখনও দেওয়া সম্ভব হয় নাই। মানুষের আত্মাকেই শুধু মহিমান্বিত করা নয়—মানুষের মনুষ্যত্বকেই এতবড় মূল্য দান করা—এ যুগের পক্ষে প্রয়োজন হইয়াছিল; আজ পৃথিবীময় মানুষের যে দুর্গতি, সেই দুর্গতি নিবারণকল্পে যে যজ্ঞের প্রয়োজন তাহাই একমাত্র কর্ম্ম, এবং সে কর্ম্মের যে প্রেরণা তাহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সেই জ্ঞানই জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান, সেই জ্ঞানই শ্রদ্ধা, সেই জ্ঞানই শুদ্ধা ভক্তি, সেই জ্ঞানই প্রেম। এবার

মানুষই হইল মানুষের সাধন-বিগ্রহ—এই জগৎই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মশরীর। পরমহংসদেব সেই ব্রহ্মশরীরকেই কালীরূপে ভজনা করিয়াছিলেন, এবং মানুষই ছিল তাঁহার চক্ষে শিব। অতিদূর অতীতের গঙ্গোত্তরী হইতে যে ধারা যুগ যুগ ধরিয়া বহিয়া আসিয়াছে—এতদিনে সেই ধারা এই বাংলা দেশে পৌঁছিয়া শতমুখে সাগর-সঙ্গমে প্রবেশ করিল। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—এই মহাবাণী একদা এক বাঙালীরই কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, আজ সেই বাণী প্রাচীন ভারতের বাণীকেই একটি নূতন অর্থগৌরব দান করিয়াছে, এবং সেই বাণীমন্ত্রে সঞ্জীবিত হইবার জন্য সারা জগৎ প্রতীক্ষা করিতেছে।

সম্প্রতি একবার দক্ষিণেশ্বরে নয়—বেলুড়ে গিয়াছিলাম। নূতন মন্দিরটির চারিদিক ঘুরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। নিম্নে পৃথিবী যাহার পাদপীঠ, ঊর্দ্ধে চন্দ্রসূর্য্য ও গ্রহদল যাহার বন্দনা করিতেছে, ভিতরে সেই মানবদেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—মন্দিরের প্রস্তরনির্ম্মিত মণ্ডপটিতে তাহারই পরিকল্পনা সৌম্যগম্ভীর ভাস্করশিল্পে প্রতিফলিত দেখিয়া শুদ্ধ সংযত মনে পূজাগৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অনেক দিন পূর্ব্বের আর এক দৃশ্য ও আর এক ভাব মনে পড়িল—পুরীর মন্দির প্রাঙ্গণে জগন্নাথের রত্নবেদীর সম্মুখে এমনই আর একবার দাঁড়াইয়াছিলাম সেখানে মন্দির মধ্যে মূর্ত্তি নয়, বিগ্রহ—বিশ্বনাথের অপরূপ রূপ; অদূরে অকূল সিন্ধু-জল তরঙ্গিত হইতেছে। এখানে বিগ্রহ নয়—মর্ম্মর-শুভ্র মনুষ্যমূর্ত্তি; অদূরে দুই তীরের মানব-বসতির তলবাহিনী জাহ্নবী করুণার দ্রব-ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে। অন্তরে কেমন এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল—এ আবার কেমন দেবতা—কেমন তীর্থ! তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ায় পূজাগৃহে সন্ধ্যারতি হইতেছে; দ্বারতলে উপবিষ্ট

ভক্ত নরনারীদলের পার্শ্বে একান্তে বসিয়া আমিও সেই আরতি উৎসব দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এমন পূজা—মনুষ্যমূর্ত্তিকে মন্দিরের দেবাসনে বসাইয়া এমন আরতি—ভারতবর্ষেও কি নূতন নয়? এ যে সত্যকার মানুষ, এ যেবিগ্রহও নয়—একেবারে প্রতিমূর্ত্তি! তখন অবতারের কথা মনে পড়িল—মানুষ-পূজার অর্থ বুঝিলাম। হিন্দুর ব্রহ্ম জগৎ হইতে পৃথকভাবে ঊর্দ্ধে বিরাজ করেন না, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার সত্তা দেশে বা কালে খণ্ডিত নয—যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান। এই সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম ব্রহ্মসত্তাই ঘন, ঘনতর ও ঘনতম আকারে আমাদের ইন্দ্রিয় বুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে। ঘন আকার সর্ব্বভূত, ঘনতর আকার মানুষ, এবং ঘনতম আকারেই বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি। বাযমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত বাষ্পরাশি যেমন ঘনীভূত হইয়া নির্ঝরের রূপ ধারণ করে, আকাশের বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মি যেমন আতসকাঁচে সংহত হইয়া অগ্নিবিন্দুতে পরিণত হয়, তেমনই সর্ব্বমানবতার মধ্যে ব্রহ্মের যে অংশ বিতত হইয়া আছে তাহারই ঘনীভূত রূপকে আমরা অবতার বলিয়া থাকি। কিন্তু এবার আমরা এইরূপ প্রকাশের অর্থ আরও ভাল করিয়া বুঝিয়াছি—সে তো ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ নয়; ব্রহ্মের আবার ঊর্দ্ধ-নিম্ন কি? তথাপি, যদি প্রকাশের মাত্রাভেদকে ঊর্দ্ধ ও নিম্ন নামে অভিহিত করা যায়, তবে ইহাই বলা সঙ্গত হইবে যে, ইহা মনুষ্যত্বের নিম্নস্তর হইতে ঊর্দ্ধতম স্তরে আরোহণ, অর্থাৎ মানুষেরই ব্রহ্মভূত অবস্থা। আর এক অর্থে অবতার শব্দটি যথার্থ হইতে পারে—সম্ভবতঃ সেই অর্থেই ঐ কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে। একই বায়ুমণ্ডলের অধঃ ও ঊর্দ্ধ স্তর আছে, এবং সকল স্তরই একই প্রবাহের অধীন। নিম্নস্তর যখন প্রাকৃতিক কারণে ভারহীন হইয়া পড়ে, তখন ঊর্দ্ধস্তর নামিয়া আসিয়া তাহার ভারসাম্য রক্ষা করে; এই

অর্থে অবতার শব্দটি সার্থক বটে। কিন্তু আমি তখন সে কথা না ভাবিয়া মানুষ-পূজার কথা ভাবিতেছিলাম। আরতি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমার সর্ব্ব সংশয় তিরোহিত হইল; ভূলুণ্ঠিত মস্তকে সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া মনে মনে উচ্চারণ করিলাম—তুমিই শিব, তুমিই সত্য; আর কোন সত্য মানুষের বুদ্ধিগোচর নয়। স্বরূপে তুমি নিরাকার—মানুষই তোমার *তটস্থরূপ*; মানুষের প্রতি প্রেম, মানুষকে শ্রদ্ধা, মানুষের সেবাই তোমার পূজা—তোমাকে প্রণাম করার ছলে সেই মানুষরূপী ব্রহ্মকেই প্রণাম করি। ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

প্রথম অধ্যায়

নবযুগের সূচনা

"Each nation like each individual, has one theme in this life, which is its centre, the principal note round which every other note comes to form the harmony......If any one nation attempts to throw off national vitality, the direction which has become its own through the transmission of centuries, that nation dies ......Every man has to make his own choice; so has every nation. We made our choice ages ago...and it is the faith in an Immortal Soul...I challenge anyone to give it up...How can you change your nature?"

"Never forget the glory of human nature! We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which *I am.*"

—*Vivekananda.*

উপরে যে কথা কয়টি উদ্ধৃত করিলাম—বাংলার নবযুগের, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় অবসানকালে, একজন বাঙালীর মুখেই তাহা উচ্চারিত হইয়াছিল। এই বাণীর পশ্চাতে যে জ্ঞান-শক্তি ও পৌরুষের ঐকান্তিক প্রেরণা ছিল—যুগনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'অনুশীলন'-ধর্ম্মে মানবত্বের এই উপাদানকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিলেও, তাহার এমন একাধিপত্য মনুষ্য সাধারণের জীবনে সম্ভব বা সুফলপ্রসূ বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু রহস্য এমনই যে, তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে আকাশ হইতে দৃপ্ত দৈববাণীর মতই ওই বজ্ররব ধ্বনিত হইল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনই ভাগীরথীর তীর হইতে বহুদূরে, সাগরপারে—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'-র সেই প্রাচীন ভঙ্গী ও ভাষায়, এক বাঙালীর কণ্ঠে যে বাণী প্রথম পুনরুদ্গীত হইল, সে বাণী—আত্মার সর্ব্ববন্ধন-মুক্তির স্বাধিকার ঘোষণার বাণী, তাহাতে প্রকৃতির সহিত বোঝাপড়া করার কোন চিন্তাই নাই। এ যেন সমতল পৃথ্বী ভেদ করিয়া সহসা এক পর্ব্বতচূড়ার অভ্যুদয় হইল; যে যজ্ঞানল এতদিন ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছিল তাহারই এক শিখা যেন আচম্বিতে আকাশ স্পর্শ করিল। বাংলার নবযুগের এই শেষ ও অভিনব বাণীর পরিচয় দিতে বসিয়াছি বটে, কিন্তু ইহা তো শুধুই বাণী নয়,—প্রতিভার দিব্যশক্তিও নয়; একদা এক দিব্য আবেশে কবি যাহা কামনা করিয়াছিলেন—

শঙ্খের মতন তুলি' একটি ফুৎকার হানি'
দাও হৃদয়ের মুখে।

—ইহাও মহাপ্রাণ-নিঃশ্বসিত হৃদয়-শঙ্খের সেই ফুৎকার। সে প্রাণ, সে পৌরুষ একটা আবির্ভাবের মত; সেই মহাজীবন হইতে পৃথক করিয়া বাণীর আলোচনা আদৌ সম্ভব নয়। ঐ মূর্ত্তির দিকে চাহিলে যুগের কথা ভুলিয়া যাইতে হয়, সনাতনের সংজ্ঞাও লোপ পায়। আজ যে প্রয়োজনে আমি এই পুরুষের প্রসঙ্গে উপনীত হইয়াছি তাহার পক্ষে অতি ধীরভাবে আলোচনায় অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু ভয় হয়, এবার হয়তো আমাকে হার মানিতে হইবে। আমার ব্যক্তিগত সাধনায় যাঁহাদের প্রভাব সব চেয়ে বেশি তাঁহাদের কথা বলিতে আমার কণ্ঠ কাঁপে নাই—আমার সাহিত্যগুরু সেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আমার বিদ্যা ও বুদ্ধি সর্ব্বদাই অতি সচেতন। কিন্তু প্রথম যৌবন হইতে আজ পর্য্যন্ত যখনই এই পুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি তখনই সকল অভিমান নিমেষে অন্তর্হিত হইয়াছে; কেবল একটি বিরাট পুরুষ-সত্তার

মহিমা আমাকে আবৃত করিয়াছে—সাগরসঙ্গমে নদীস্রোতের মত আমার প্রাণস্রোত ক্ষণেকের জন্য তাহাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। পরক্ষণে ইহাও মনে হইয়াছে, এবং সে বিশ্বাস আজিও তেমনই আছে, যে—পুরাকালের কথা বলিতে পারি না—ইদানীন্তন কালে বাঙালী জাতির মধ্যে এত বড় পুরুষ আর জন্মে নাই। তাই যখনই দেশী ও বিদেশী সকল সাক্ষীর মুখে এই একই কথা শুনি—

It was impossible to imagine him in the second place. Wherever he went he was the first.

কিংবা—

His pre-eminent characteristic was kingliness, and nobody ever came near him either in India or America, without paying homage to his majesty.

—তখন আর এক অভিমানে আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাই, সে অভিমান বাঙালীত্বের অভিমান। যে বেদান্তকে ভারতীয় সাধনা আত্মার উত্তুঙ্গ শিখরে বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের আশ্রয় করিয়াছিল, সেই বেদান্তের বাণীকে শুধু জ্ঞানে নয়—প্রেম ও কর্ম্মে মানুষের গভীরতম হৃদয়-সংবেদনায় এমন করিয়া প্রাণের ছন্দে স্পন্দিত করিতে একমাত্র বাঙালীই পারিয়াছে, আর কেহ পারে নাই—পারিত না। বৈষ্ণবের ভাব-কল্লোলিনী-বিধৌত পলিমাটি এবং শাক্তের হৃদয়াবেগ-বর্জ্জিত কঠিন সাধনার এই সুদৃঢ় তটভূমিতে—এই শ্যামলিমাবেষ্টিত শ্মশান-মৃত্তিকায়—হিমালয়ের দেওদার কে রোপণ করিয়াছিল? জলমাটির গুণেই সেই দেওদার-শাখায় এমন সুস্বাদু পিপ্পল ফলিয়াছে! বাংলার নবযুগ সম্পর্কে বাঙালী-প্রতিভার সেই দিকটির পরিচয় লওয়াও যেমন আবশ্যক, তেমনই, সেই প্রতিভা

যে শুধুই বাণী-প্রতিভা নয়, তাহাও বুঝি—তাই বাণীকে অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, আমি সেই ব্যক্তিচরিত্রের বৃন্তটি ধরিয়া—বাণীর রূপ সাজাইবার চেষ্টা করিব।

* * *

ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগ-বন্যার প্রধান ধারায়, বৃহত্তর তরঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে. বহু জ্ঞানী ও সাধকের বিচিত্র প্রয়াস নানা রূপে প্রবাহিত হইয়াছে; সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, এবং সর্ব্বশেষে রাষ্ট্রনীতি—এই সকল ক্ষেত্রেই অল্পাধিক উদ্যম—সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সন্ধান শেষ পর্য্যন্ত একরূপ অব্যাহতই ছিল। খণ্ড খণ্ড ভাবেও এ সকলের পরিচয় ঐতিহাসিকের পক্ষে কর্ত্তব্য বটে, আমি কেবল তাহাদের অন্তর্গত প্রধান প্রবৃত্তি এবং তৎসম্পর্কিত কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের একটা স্থূল পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমি এ পর্য্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা ও তজ্জনিত সাহিত্যিক ভাবচিন্তার ভিতর দিয়া এই যুগের প্রধান প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়াছি; এবং তাহারই প্রসঙ্গে, এ জাতির জাতীয় সংস্কারে যে আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত আছে—যাহা তাহার প্রতিভার মূলে স্বপ্ন-চেতনার মত অস্ফুট রহিয়াও শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহার কথাও বলিয়াছি। যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাতিভ দৃষ্টিতে নবযুগ-প্রবৃত্তির সহিত জাতির এই প্রাক্তন সংস্কারের দ্বন্দ্ব কি আকারে দেখা দিয়াছিল, এবং কোন্ মন্ত্রে তিনি তাহার নিরসন করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি। কিন্তু এ জাতির অস্থিমজ্জাগত সংস্কার সেই সমস্যাকে যে এত সহজে বিদায় করিবে না—সমস্যার মূল যে আরও গভীর, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বেই পাওয়া যাইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎ-কালেই আর এক ক্ষেত্রে আর এক আন্দোলন ক্রমেই প্রবলতর হইয়া

উঠিতেছিল। নবজাগরণের অনতিকাল মধ্যেই, প্রথমে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে, এবং শেষে আধ্যাত্মিক কল্যাণ-পিপাসার বশে, এক গুরুতর ধর্ম্মান্দোলন শুরু হইয়াছিল—সে আন্দোলন শুধুই চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, শুধুই সমাজ-চৈতন্যে নয়, ব্যক্তির স্বকীয় চৈতন্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাই স্বাভাবিক। অতি দীর্ঘ নিদ্রার অবসানে এ জাতি এক নূতন জগতে চক্ষুরুন্মীলন করিল—সে জগৎ তাহার সেই প্রাক্তন পল্লী-সমাজের জগৎ নয়; আকাশ যেন অনেক দূরে উঠিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই দিক্‌দিগন্ত হইতে মানবেতিহাসের বিপুল ও বহুবিচিত্র ধারার কলরোল তাহার জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে—শুধুই কর্ণে কলগর্জ্জন নয়, সেই স্রোত তাহার বক্ষতটে প্রহত হইতেছে। সেই আঘাত সর্ব্বশেষে তাহার প্রাণধাতুকে স্পর্শ করিল, এবং প্রতিঘাতে তাহার স্বকীয় সংস্কার যেন ভিতরে ভিতরে প্রবলভাবে নাড়া পাইল। নবযুগের সংক্রমণ ও তাহার প্রভাব রামমোহনের চিন্তায় সর্ব্বপ্রথম ধরা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখপ্রসারী হইলেও উপরের দিকেই নিবদ্ধ ছিল; নূতন আবহাওয়ার উপযোগী একটা স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে ভিত্তি যতটুকু দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি তাহার অতিরিক্ত ভাবনা করে নাই—ভূমিকম্প প্রভৃতির চিন্তাকে তিনি কখনও আমল দেন নাই। ধর্ম্মের ব্যাপারেও, কেবল সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের গ্রন্থি একটিমাত্র আঘাতে ছেদন করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি খ্রীষ্টান বা সেমিটিক ঈশবাদকেই বেদান্তসূত্র দ্বারা শোধন করিয়া একটি অতি সহজ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের ধর্ম্ম যতই যুক্তিসিদ্ধ ও সুকল্পিত হউক, তাহা মূলে অ-ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত —তাহাতে এমন সঞ্জীবনী অধ্যাত্ম-প্রেরণা ছিল না, যাহার বলে মানুষ

শেষ পর্য্যন্ত নিজের আত্মার উপরে আস্থা না হারাইয়া একটা মহাসঙ্কটে উদ্ধার পাইতে পারে। যে য়ুরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ ও যে ধর্ম্মনীতি একদা রামমোহনকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, তাঁহার যুক্তিবাদের সহায় হইয়াছিল, সে আদর্শ ও সে নীতির পরিণাম শতাব্দী-শেষে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বরং রামমোহনের প্রতিভার অসাধারণত্ব ইহাই যে, তিনিই প্রথম ভারতীয় সাধনার গঙ্গোত্তরী-ধারাকে ভিন্ন-পথগা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সাময়িক পঙ্কোদ্ধারের কাজ হইয়াছিল! সেই বুদ্ধির জাগরণই সে যুগের প্রথম লক্ষণ,—চৈতন্য-স্ফুরণের আদি অবস্থা যে তাহাই। দ্বিতীয় অবস্থায় হৃদয় বা প্রাণের জাগরণ—বিদ্যাসাগরে ও মধুসূদনে, দুই দিক দিয়া তাহাই ঘটিয়াছিল। তৃতীয় অবস্থায বুদ্ধি ও হৃদয় দুয়েরই সমান জাগরণ—সুস্থ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, তাহার বিগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্র। ইহারও পরে, শতাব্দীর-শেষ-ভাগে, জাতীয় জাগরণের প্রায় তূরীয় বা চতুর্থ অবস্থায়, সেই সকলের সহিত আর এক যে-বস্তুর উন্মেষ হইল, অন্য নামের অভাবে তাহার নাম দিব 'আত্মা'। মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও প্রাণ—সকলই ইহার সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত ; এই আত্মার দৃষ্টিতে যুগসমস্যা এমন একটি আকার ধারণ করিল যে, তাহা যুগ-জাতি-দেশ অবলম্বনে সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদেশের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও জীবন-জিজ্ঞাসা—ইহাতেই যুগপ্রবৃত্তির আরম্ভ, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াও হইতে থাকে। প্রতিক্রিয়ার কারণ—বহুকাল-অর্জ্জিত সংস্কার ; এই সংস্কারই অন্ধসংস্কাররূপে জীবনকে গতিহীন করিয়াছিল। নবযুগ ও তাহার অনুষঙ্গী সেই পাশ্চাত্য প্রভাব, এই সুপ্ত সংস্কারের এতই বিরোধী যে, দেশের মজ্জাগত

সমাজ একটা অজ্ঞাত অস্পষ্ট ভয়ের বশীভূত হইয়া সেই প্রভাবের গতিরোধ করিতে চাহিল, কোথায় যে বিরোধ—ভিতরের কোন্ মূল গ্রন্থিতে টান পড়িতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, বিচার-বুদ্ধিকে দমন, এবং অবোধ চিত্তবৃত্তিকে প্রাণপণে আশ্রয় করিয়া, নির্জ্জীব শাস্ত্র-বচনের মহিমা-ঘোষণায় অধীর হইয়া উঠিল। অপর দিকেও উৎকণ্ঠা কম ছিল না, প্রাণের প্রবল মুক্তি-কামনা—জীবনকে বিধিমতে ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষাও যেমন জাগিযাছে, তেমনই ব্যক্তির আত্ম-চেতনা প্রখর হইয়া উঠিয়াছে; তাহার ফলে আধ্যাত্মিক সত্য-মীমাংসাও নবযুগের আন্দোলনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল; শেষের দিকে ইহাও একটা পৃথক খাতে বহিতে শুরু করিযাছিল। রামমোহন-পন্থীরা এই আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে বুদ্ধির শাসনে সংযত রাখিবার চেষ্টা করিলেও তাহা যে সফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত পুরুষেরও অবশেষে সন্ন্যাস-গ্রহণ। আবার নিছক যুক্তি-বিচার যে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল নয়, সেই গভীরতর পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য জাগ্রত বুদ্ধিবৃত্তির উপরে এক প্রকার রস-চেতনাকে প্রাধান্য দিতেই হয়, সে যুগের ধর্ম্মান্দোলনের সর্ব্বপ্রথম ও শক্তিমান নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্রই তাহার প্রমাণ। কিন্তু এ সকলের দ্বারা যুগ সমস্যার কোনরূপ সমাধান হয় নাই; কেবল ইহাই প্রমাণ হয় যে, যুগধর্ম্মের প্রভাবে এ জাতির চেতনার উপরি-স্তরে যত তরঙ্গই উত্থিত হউক, তলদেশে একটা গভীরতর আকূতি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল; যুগ ও সনাতন, সর্ব্বমানবীয় চেতনা ও জাতীয় সংস্কার, এই দুইয়ের সংঘর্ষ ভিতরে ভিতরে বৃদ্ধি পাইতেছিল; ফলে, একটা ঘোরতর আধ্যাত্মিক সংশয়-সঙ্কট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা অতিশয় মেধাবী অথচ তীক্ষ্ণ

অনুভূতিশীল—তাই জীবনের আদি-অন্ত সম্বন্ধে যাহারা কোন কাটা-ছাঁটা ধারণায় সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—তাহারা শেষ পর্য্যন্ত জীবন সম্বন্ধে নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে যুগের আদি-প্রবৃত্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিযাছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপ্তি ঘটিযাছিল, এক্ষণে তাহা প্রশমিত হইযা বাঙালীর জীবনযাত্রায় তথা চরিত্রে যে পরিণতির আভাস দেখা দিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই লক্ষ্য করিয়া অতিশয় বিচলিত হইযাছিলেন, তাহারই নিবারণকল্পে তিনি তাঁহার প্রতিভার সকল শক্তি নিযোজিত করিয়া জাতির জীবন-রক্ষাব একটা পন্থা নির্ণয করিযাছিলেন। নব্যশিক্ষিত-সমাজের দাসত্ব-প্রীতিও তিনি যেমন লক্ষ্য করিযাছিলেন, তেমনই তাহার চরিত্রে দারুণ স্বার্থসুখ-লোলুপতা ও তাহার কারণ দিবা চক্ষে দেখিতে পাইযাছিলেন ; তাহার এই মনুষ্যত্ব-লোপ এবং অচিরকালের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অধঃপতনের সম্ভাবনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিযাছিল। তথাপি তাঁহার ভরসা ছিল শিক্ষিত বাঙালীর উপরেই ; তাই উৎকৃষ্ট ভাব ও চিন্তারাজি অকাতরে ছড়াইয়া তিনি তাহাদের চিত্তশুদ্ধির প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই চিন্তা-রাজির মধ্যে দুইটি ছিল প্রধান—সার্ব্বজনীন মনুষ্যপ্রীতি ও বিশেষভাবে দেশপ্রীতি, এবং সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার জন্য আত্মানুশীলন,—দেহ, মন ও প্রাণের উৎকর্ষসাধন। ইহা যে আপামর সাধারণের জন্য

নয়, তাহা তিনি জানিতেন, সে আদর্শ ও তাহার সাধনা কেবল শিক্ষিত-সমাজেরই আয়ত্ত। বৃহত্তর সমাজের দারুণ দুর্গতি ও অবনতির অবস্থা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, সে সমস্যাও তাঁহার চিন্তায় অল্প স্থান অধিকার করে নাই ; কিন্তু সে সকলের দায়িত্ব তিনি আধুনিক কালের 'ব্রাহ্মণের' উপরেই দিয়াছিলেন : এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আদর্শবাদী, তেমনই aristocrat তথাপি নবমানবধর্ম্ম-প্রচারক বঙ্কিম, দেশপ্রেম-মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম, এই aristocrat বঙ্কিম একদা যেমন 'সাম্য' নামক প্রবন্ধমালা রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার সেই আদর্শবাদী ভাব-চিন্তার মধ্যেই এমন বীজ নিহিত ছিল, যাহা অতঃপর সেই আদর্শের উচ্চভূমি বিদীর্ণ করিয়া বাস্তবকেই আরও বিরাট আকারে সঙ্কট-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই বিবেকানন্দ : একের সহিত অপরের যুগগত পরম্পরতার যোগই শুধু নয়, ভবাগত যোগও নিশ্চয় ছিল—সে যোগ সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ যোগ না হইতে পারে, কিন্তু এতবড় বাণীবরপুত্রের সেই বহু-প্রচারিত বাণী বিবেকানন্দের মত পিপাসু যুবকের পানীয় হয় নাই, ইহা সম্ভব নয় : রামমোহন, কেশবচন্দ্রকে যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রকেও তেমনই তিনি তাঁহার দিক দিয়া হজম করিয়াছিলেন, এবং বঙ্কিমের চিন্তাধারার প্রায় বিপরীত মুখে হইলেও, বঙ্কিম যেখানে শেষ করিয়াছিলেন ঠিক সেইখান হইতেই তাঁহার যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও মনে হয়, বিবেকানন্দের গন্তব্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি ছিল না, বরং অতিশয় হৃষ্টচিত্তেই তিনি তাহাতে সম্মত হইতেন ; কিন্তু পঙ্গুর পক্ষে সেরূপ গিরিলঙ্ঘন তিনি আদৌ সাধ্য বলিয়া মনে করিতেন না, এমন অসীম সাহসের যোদ্ধৃ-মনোভাব তাঁহার ছিল না। বঙ্কিম ছিলেন ভাবুক ও চিন্তাশীল, প্রাকৃতিক নিয়তি-নিয়মের অনুবর্ত্তী, ক্রমবিকাশবাদী।

বিবেকানন্দ আত্মার স্ব-শক্তিতে আস্থাবান, তিনি প্রকৃতির ধমক মানিতেন না। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যতই বিপরীত হউক, মূল সমস্যা উভয়ের নিকটেই এক ; আবার তত্ত্বের দিক দিয়া যেমনই হউক, ভাব-প্রেরণায় উভয়ের সগোত্রতা এত অধিক যে, এককালে বাঙালী যে উভয়কে একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মনুষ্যত্বের উদ্ধার-সাধন যেমন উভয়েরই ছিল একমাত্র ব্রত, তেমনই প্রেম ও পৌরুষ, এই দুই ছিল উভয়ের সাধন-মন্ত্র ; এবং উভয়েরই মতে, সেই প্রেম ও পৌরুষের মুখ্য সাধনক্ষেত্র ছিল স্বদেশ ও স্বজাতি-সমাজ। কিন্তু বিবেকানন্দেই সে যুগের জাগরণ প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। সে জাগরণের এইরূপ ক্রমনির্দ্দেশ করা যায় ঃ—প্রথম, মনুষ্য-জীবনের গৌরব-বোধ ; দ্বিতীয়, জীবন-জিজ্ঞাসা, মনুষ্যত্বের আদর্শ-সন্ধান, ও জীবনের মাহাত্ম্য-ঘোষণা ; তৃতীয়, জীবনের মহিমাই মানুষের মহিমা নয় ; জীবন-সাধনার কোন স্বতন্ত্র আদর্শ নাই : মানুষই মানুষের আদর্শ. মানবাত্মার মহিমাই সকল মহিমার মূল ; জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে বন্ধনমুক্ত আত্মার সেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাই মনুষ্য-জীবনের নিঃশ্রেয়স। এবার এই বাণীর কিছু পরিচয় দিব, কিন্তু বাণী ও ব্যক্তির পরিচয় একই—বরং ব্যক্তি আগে, বাণী পরে।

তখন ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ পাদে আসিয়া পৌছিয়াছে ; ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজীশিক্ষার ফলে বাঙালী তখন বড় মোহকর স্বপ্ন দেখিতেছে, সে স্বপ্ন সফল হইতেও যেন আর বিলম্ব নাই ; বাঙালী তখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেও আরম্ভ করিয়াছে! এদিকে সরকারী চাকুরীর মাহাত্ম্য সমাজে এক নূতনতর কৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, জীবনযাত্রায় পরিবর্ত্তন শুরু হইয়াছে। কলিকাতা শহর এক নূতন

নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়াছে ; অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙালী যেখানে যেটুকু সংস্কৃতি অর্জ্জন করিয়াছিল এই নগরী তাহারও সবটুকু আকর্ষণ করিতেছে ; বাঙালীর চিত্তভূমির—তাহার হৃদয় ও মস্তিষ্কের—সবটুকু শক্তি তাহার একাধিকারে বর্ত্তিয়াছে। শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্পর্কিত, এমন কি, নূতন সাহিত্যের জন্মঘটিত যত কিছু আন্দোলন, এই শহরেই সব হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনের হিসাবনিকাশ প্রায় শেষ করিয়া বাঙালী তখন নূতনের সঙ্গেও একটা আপোষ করিয়া লইয়াছে, সম্মুখে যেন বাঁধা পথ ; সে পথ যেমন উন্মুক্ত, তেমনই নিঃসঙ্কট। দাসত্বের অন্ন সুলভও বটে, রুচিকরও বটে, নিজের উপরে অথবা ভগবানের উপরে যে বিশ্বাস তাহা ইংরেজের উপরে স্থাপন করিযা বাঙালী একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

কিন্তু আসলে এই স্বপ্ন-বিলাস ও সুখের আশ্বাস—নিরুপায়ের আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র ; তলে তলে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে, সংশয়ও দেখা দিয়াছে—পশ্চিম এ জাতির মস্তিষ্কে হানা দিয়াছে—তাহার জীবনকে দুর্ব্বল করিয়াছে। একদিন যাহার নূতনত্বে সে অধীর হইয়াছিল—সেই নূতনকে লইয়া লোফালুফি করিয়া, তাহাকে বাজাইয়া এবং চতুর্দ্দিকে ছুঁড়িয়া ছড়াইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, এক্ষণে সেই নূতনের উন্মাদনা-শেষে তাহার দেহে-মনে একটা বেদনা জাগিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম সেই বেদনা সজ্ঞানে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই যুগের যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভরসাকে তিনিই একটি প্রকৃষ্ট বাণীরূপ দিয়াছিলেন বটে—যুগনায়করূপে জাতীয়-জাগরণের প্রধান পুরোহিতরূপে তিনিই দাঁড়াইয়াছিলেন—তথাপি, এই বেদনা তাঁহাকে বিহ্বল করিয়াছিল, জাতির সেই হীন আত্ম-সন্তোষ ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য দর্শনে

তাঁহার লজ্জা ও ক্ষোভের অবধি ছিল না। ইংরেজীশিক্ষার পদ্ধতি-দোষে তাহার সুফল অপেক্ষা কুফল বৃদ্ধি পাইল, সে শিক্ষার একমাত্র তপঃফল হইল চাকুরি লাভ—সরস্বতীর কমলবনে কমলবিলাসী বাঙালী চাকুরি-মধু-পানে বিভোর হইয়া উঠিল। বাঙালীর নিজস্ব সমাজ-জীবনও নষ্ট হইতে চলিল; পল্লীর প্রতিবেশে, মাঠে, বাটে, প্রান্তরে সেই সরল উন্মুক্ত জীবন যাপন করিয়া সে যেটুকু প্রাণশক্তি বজায় রাখিয়াছিল তাহা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল; কলিকাতা শহরের বদ্ধ বাগতে নূতন নাগরিক সুখোপকরণ তাহার সেই স্বাস্থ্য নাশ করিয়া অহিফেনসুলভ জড়তা বৃদ্ধি করিল—প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু নেশার ঘোরে, নূতনত্বের মোহে, সেই অস্বাভাবিক অবস্থা ক্রমে অভ্যস্ত হইযা আসিল; পল্লীসমাজের বন্ধন যেমন দুঃসহ, পল্লীবাসও তেমনই অসুখকর হইয়া উঠিল। বাস্তব জীবনে দাসত্বপ্রীতি যতই বাড়িতে লাগিল—মনে ততই স্বাতন্ত্র্য-অভিমান জাগিয়া উঠিল; ইংরেজের চাকুরী ও ইংরেজের আইন সেই স্বাতন্ত্র্যের পোষাকতা করিল; ইংরেজী বিদ্যার অভিমানও মনের সঙ্কোচ ঘুচাইল। এক দিকে চাকুরি-গৌরব, আর এক দিকে Mill, Bentham, Spencer; এক দিকে দাশুরায়ের পাঁচালী, আর এক দিকে Shakespeare, Milton, Byron; এক দিকে মাহেশের রথ, বাগানবাড়ির আমোদ, অপর দিকে ব্রাহ্ম-মন্দিরের উপাসনা; —সে যেন এক অপূর্ব্ব প্রহসন! এই দুইয়েরই রস যে সমভাবে উপভোগ করিতে পারে, সে 'হুতোম পেঁচার নক্শা' লিখিয়া প্রবল হাস্যবেগ প্রশমিত করে। এই জীবনই সেকালের চতুর্ব্বর্গকামী বাঙালী-সন্তানের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ তখনও একেবারে মরে নাই—এই সমাজই ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ এ পর্য্যন্ত সমাজের স্থিতি রক্ষা

করিয়াছে ; আবার এই সমাজই সর্ব্বপ্রকার বিদ্রোহের বীজ ধারণ ও পালন করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে, ইংরেজীশিক্ষার সুফলস্বরূপ, যতকিছু আন্দোলন ঘটিয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিতে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে—এই শ্রেণীর মানুষ ; শুধুই বিদ্রোহের মন্ত্র-রচনা নয়, তাহার আগুনে ঝাঁপ দিয়াছে ইহারাই। উৎকৃষ্ট প্রতিভারও জন্ম হইয়াছে ইহাদের মধ্যে, কেবল দুইজন এই শ্রেণীভুক্ত নহেন—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ। ইহার কারণ আছে ; বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের যে একটি মহৎ গুণ—তাহা এই শ্রেণীর জীবনেই সম্ভব। তখনকার একান্নবর্ত্তী পরিবারে জীবিকা-অর্জ্জনের ভার প্রায় একজনের উপরেই থাকিত, অথবা পৈতৃক জমিজমার দ্বারাই তাহা এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে এক দিকে যেমন আলস্য প্রশ্রয় পাইত, তেমনই স্বল্পসুখসন্তুষ্ট, দায়িত্ববন্ধন-মুক্ত, ভাবুক ও চিন্তাপ্রবণ বাঙালীর ভাবচর্চ্চার বড় অবকাশ হইত। যে বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত নয়, অথচ জাতিস্বভাবসুলভ চিন্তা ও কল্পনাশক্তির অধিকারী—কোন একটি ভাব-সত্যের প্রতিষ্ঠায় তাহার পক্ষে সর্ব্বস্বত্যাগ আদৌ দুষ্কর নয়, ইহার প্রমাণ বাংলা দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও শেষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যাইবে। সেকালের কলিকাতার সেই সমাজে, সেই নব্য জীবনযাত্রার অবসাদকর আবহাওয়ায়, রুদ্ধ আলোক ও বদ্ধ বায়ুর সেই শ্বাসকৃচ্ছ্রতার মধ্যে, স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের সংঘর্ষে জাতির সেই মানস-বৈকল্যের অবস্থায়, আত্মক্ষয়কারী দারুণ দাসত্ব-ব্যাধি যখন সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, তখন কলিকাতারই এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সেই শ্রুতি-প্রসিদ্ধ নাচিকেত-অগ্নির একটি শিখা সকলের অগোচরে জ্বলিতে আরম্ভ করিল ; এবারে শুধু জীবনের আরাধনাই নয়, মৃত্যুর বদ্ধমুষ্টি হইতে অমৃত-ভাণ্ড উদ্ধার করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিল।

অতি অল্প বয়সেই এই তেজ—সর্ব্ববন্ধনমুক্তির সেই দুর্দ্দমনীয় পিপাসা—বিবেকানন্দের জীবনে দেখা দিয়াছিল; ইহাকেই আমাদের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় 'শৈব তেজ' বলে। অপরের উপদেশ নয়, পরের সাক্ষ্য নয়, কোন তর্ক-যুক্তির পুঁথিগত সিদ্ধান্ত নয়—পরোক্ষ আপ্তবাক্যে আশ্বাস নয়, নিজেরই জ্ঞান-বুদ্ধি ও অপরোক্ষ অনুভূতির সাহায্যে, জীবনের তথা মানবীয় সত্তার অর্থ সন্ধান করিতে হইবে, যদি কোন সত্য থাকে তাহা সাক্ষাৎকার করিতে হইবে—ইহাই ছিল সেই বালকের প্রাক্তন সংস্কার, সে সংস্কার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়তর হইয়াছিল। সেকালের স্কুলে ও কলেজে অধ্যেতব্য যাহা কিছু ছিল তাহা যেন গণ্ডুষে পান করিয়া, জ্ঞানপন্থী অধ্যাত্মবাদীদের সঙ্গ করিয়া, তাহাদের তত্ত্ববিচার শুনিয়া, কিছুতেই পিপাসা মেটে না, বরং সংশয় বাড়িয়া যায়, আত্মা আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিবেকানন্দ ছাত্রাবস্থাতেই যুক্তিপন্থী নব্য-সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছিলেন—সেও যেন অন্ধভক্তি ও গুরুবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। দেশে তখন পাশ্চাত্য বিদ্যার মোহ কিছু কমিয়াছে, বন্যার সেই জলরাশির নিম্নে পঙ্ক দেখা দিয়াছে; মানবত্বের মহিমা-বোধ যতই টিকিয়া থাকুক, সেই ভাবের আবেগ বাধা পাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কারণ ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য জাতির সেই মানবতন্ত্র-শাস্ত্রের সাধন-পীঠে আর এক মন্ত্র মানবতাকে পরিহাস করিয়া জয়ী হইতে চলিয়াছে। মানবধর্ম্মকে প্রকৃতিধর্ম্মের সহিত বাঁধিয়া লওয়ার ফলে, যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিধর্ম্ম উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিতেছিল তাহাতে মানুষের আত্মা ক্রমেই জড়শক্তির বশীভূত হইতেছিল—প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি মনুষ্যজীবনের আত্মিক সম্পদ মানুষ তখন হারাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তখনও সে ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে নাই—আত্মার

স্বাতন্ত্র্য-মহিমা নয়, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের অনুকূল যে যুক্তিবাদ তাহাই পরম উপাদেয় হইয়াছে ; তাহার কারণ, জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। তাই সেই নূতন নাগরিক জীবনে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির যে আত্ম-প্রসাদ—পুঁথিগত যুক্তির বলে কুসংস্কার-মুক্তির যে দুঃসাহস—তাহাই পরম জ্ঞানের পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিকে শাস্ত্র, গুরু ও ব্রাহ্মণে ভক্তি, এবং অপর দিকে মানস-মুক্তির এই যুদ্ধঘোষণা—এই দুইয়ের মধ্যে যুবক বিবেকানন্দ যে শেষেরটির দিকেই আকৃষ্ট হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। সংস্কার-কৈঙ্কর্য্যের উচ্ছেদ—মনের মুক্তিই তো আত্মার উদ্ধারসাধনের প্রাথমিক উপায়, মনুষ্যত্বের যাহা সার সেই পৌরুষের ("পৌরুষং নৃষু") ইহাই তো প্রথম পরীক্ষাস্থল। কোন জ্ঞান, কোন তত্ত্ব, কোন গুরুবাক্যে প্রয়োজন নাই—আগে চাই নিজ আত্মার স্বাধীনতাবোধ, তাহার তুলনায় আর সকলই তুচ্ছ।

বিবেকানন্দ-চরিত্রের এই প্রধান লক্ষণ তখন হইতেই, অথবা আরও পূর্ব্ব হইতেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। সে চরিত্র যেন একটি শাণিত ইস্পাতফলক, তাহার ধার—ওই প্রখর মুক্তি-পিপাসা, সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণুতা। কিন্তু প্রথম জীবনের সেই দুর্দ্ধর্ষ আত্ম-স্বাতন্ত্র্য এবং আজন্ম-শাণিত সেই জ্ঞান-পিপাসার তীক্ষ্ণ তরবারিও শেষে বড় কাজে লাগিয়াছিল, তাহার অন্তরস্থ সেই অতি-কঠিন ইস্পাতের দ্বারাই যে নূতন অস্ত্র নির্ম্মিত হইল তাহাতে মাটির উপরকার বনগুল্মলতাই নয়, তলদেশের শিকড়গুলা পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিবার উপায় হইল ; বঙ্কিমচন্দ্র মাটির উপরকার ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্টি করা তখনই আবশ্যক বোধ করেন নাই ; তিনি ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, সমন্বয়পন্থী শাক্ত সাধক, এমন উগ্র অদ্বৈতবাদকে তিনি ভয় করিতেন।

বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের প্রথম যৌবনের সেই অদম্য জ্ঞান-পিপাসা ও স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহার কথা বলিয়াছি; এ চরিত্রের মূল গ্রন্থি তাহাই বটে, কিন্তু তাহাই সব নয়। সে চরিত্রের যে দিকটি অসাধারণ, যাহা মহামনীষিগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে, সেই দিকটির কথা এইবার বলিব। ভগবান বুদ্ধের প্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার নিজের সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশের কথা স্মরণ হয়, এবং তাহাতেই অনুমান করা যায়, বিবেকানন্দ কি কারণে আজীবন বুদ্ধকে এত ভক্তি করিতেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেও যেমন তিনি বুদ্ধগয়ায় গিয়া বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রোমাঞ্চকলেবর হইয়াছিলেন, তেমনই জীবনের সর্ব্বশেষ তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন সারনাথে। তিনি এমন কথাও বলিতেন যে, অতি অল্প বয়সে ভাবাবেশে তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ-দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্য নয়, বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহার আত্মার সগোত্রতা ছিল—তিনিও অতীত ও অনাগত বুদ্ধগণের বংশে জন্মিয়াছিলেন; বুদ্ধের মতই তিনি যত বড় সন্ন্যাসী, তত বড় প্রেমিক। যে-পুরুষ কোন বন্ধন মানিবে না, দেহের বন্ধনও যাহার কাছে দুর্ব্বিষহ, কৈবল্য-মুক্তির পরমানন্দ ভিন্ন আর কিছুতেই যাহার রুচি ছিল না, সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেশকে ও দেশের মানুষকে যেরূপ ভালবাসিয়াছিলেন, তেমন ভালবাসা বোধ হয় আর কেহই বাসে নাই। ইহার কারণ যাহাই হউক, সেই প্রেমের অপূর্ব্ব আবেগ তাঁহার ব্যক্তিগত মুক্তিপিপাসাকেও দমন করিয়া, দেশের মুক্তি-কামনা হইতেই, জগতের হিতার্থে তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল। এই প্রেম একটা আধ্যাত্মিক রসাবেশ নয়, ইহাতে এক বিশাল হৃদয়ের অসীম দুঃখবোধ ছিল; এ প্রেম খাঁটি মানবীয় প্রেম।

বিবেকানন্দের ত্যাগ-বৈরাগ্য এতই বিশুদ্ধ ও এমনই মজ্জাগত যে তাহার সহিত এই ধরনের প্রবল হৃদয়-সংবেদনা স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। যে একদিন এক মুহূর্ত্তও আত্মার স্বরূপ-মহিমার কথা ভুলে নাই—সেই আত্মার লেশমাত্র অজ্ঞান-মোহ, বন্ধন বা দুর্ব্বলতা, যে সহ্য করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার হৃদয়াবেগকে যে মাত্রাস্পর্শ-জনিত ভাবালুতা ("overflow of the senses") বলিয়া ধিক্কৃত করে, তাহার সেই জ্ঞানাগ্নি-শুষ্ক আঁখিপল্লবে এমন অশ্রুধারা উদ্গত হয় কেমন করিয়া?

এ রহস্য দুরবগাহ; হয়তো মানব-মাহাত্ম্যের এই অভিনব রূপ এ যুগের শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,—Humanism-এর অন্তর্গত যে গভীরতম তত্ত্ব, তাহারই চরম ও পরম প্রকাশ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহার যে কারণই নির্দ্দেশ করি না কেন, ইহার এই রূপকে—বুদ্ধির দ্বারা নয়, একরূপ মিস্টিক চেতনার দ্বারাই—উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ, দেহ ও আত্মা, জীবন ও মহাজীবন, দ্বৈত ও অদ্বৈত এখানে এমন একটা নির্দ্বন্দ্বতার ইঙ্গিত করিতেছে,—"বাচো যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। এখানে জ্ঞান যেন প্রেমের দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া আরও স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—নিদাঘ-দিনের দাহশেষে তারকাখচিত আকাশ যেমন আরও উজ্জ্বল, আরও সৌম্য-গম্ভীর হইয়া উঠে। মহাযোগী মহাদেবের কণ্ঠে সেই যে গরল-নীলিমা, তাহার জ্বালা-বোধ কি কম? সেই গভীর জ্বালাকে নিঃশেষে পান করিয়াই তিনি ব্যোমকেশ হইয়াছেন; তাই তাঁহার ললাটনেত্রের সেই জ্ঞান-বহ্নিও শশিকলার স্নিগ্ধকিরণে করুণ হইয়া উঠে! তথাপি বিবেকানন্দ মহাদেব নন—মানুষ।

উপমা-রূপকের ভাষা ছাড়িয়া—মনুষ্যচরিত্র হিসাবেই ইহার কারণ-সন্ধান ও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব। বালক বিবেকানন্দের সেই দুর্দ্ধর্ষ

জ্ঞানাভিমানের ঊর্দ্ধফণা কোন্ মন্ত্রৌষধির বলে রুদ্ধবীর্য্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি। কিন্তু এই প্রেমের অঙ্কুর তাঁহার নিজের চরিত্রেই আজন্ম নিহিত ছিল—কেবল বিকাশের অপেক্ষা মাত্র। আমি বিবেকানন্দ-চরিত্রের যে উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যস্পৃহার কথা বলিয়াছি, তাহা ব্যক্তির ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বাভিমান নয়—তাহা পরের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান নয়, সেই মর্য্যাদা-বোধ ব্যক্তির নয়—আত্মার। আত্মারই সেই মর্য্যাদা-বোধ তাঁহাকে এত বড় প্রেমিক করিয়া তুলিয়াছিল কেমন করিয়া, তাহাই বলিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্তর্জ্জীবনের ইতিহাস ও বৈরাগ্যের সংস্কার

ব্যক্তির স্বাধিকার-বোধ ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান এক বস্তু নয়; ঠিক সেই কারণে স্বাধীনতার অভিমানও দুই ক্ষেত্রে দুইরূপ। একটিতে যেমন সর্ব্ববিষয়ে দুর্ব্বলতাকে অস্বীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ পায়, এবং তাহা নিজের ও পরের নিকটে প্রমাণ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া থাকে—এবং সেইজন্য একটা প্রচ্ছন্ন আত্মাভিমান থাকিবেই; অপরটিতে তেমনই ক্ষুদ্রতা বা দুর্ব্বলতার সংস্কারমাত্র না থাকায়, এবং তাহার স্থলে আত্মার মহত্ত্ববোধ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে বলিয়া, অধিকার অপেক্ষা একরূপ দায়িত্ব-চেতনাই আত্মচেতনাকে প্রবুদ্ধ করে; সে দায়িত্বও বন্ধন নয়—কারণ, তাহাতে আত্মাতিরিক্ত আর কিছুর বশ্যতা নাই। ব্যক্তিত্বের যে অভিমান, তাহার মূলে আছে একরূপ মমতা বা আত্ম-প্রীতি: সেই আত্ম-প্রীতি অনেক স্থলে প্রেমের ছদ্মরূপ ধারণ করে, আমরা সাধারণতঃ সেই প্রেমেরই জয়গান করি। সেই প্রেম যে নিতান্তই মমতা-মূলক তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি বটে, তথাপি যে-প্রেম ব্যক্তিসম্পর্কবর্জ্জিত, যাহাতে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অনুভূতি নাই—সেই সুখের তীব্রতা ও দুঃখের হাহাকার নাই—তেমন প্রেম আমাদিগকে তৃপ্ত করে না; মানুষ যখন এই 'আমি'র অভিমানকে অস্বীকার করে, তখন তাহাকে আমরা বিরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া থাকি, তাহার সহিত আমাদের কোন আত্মীয়-সম্পর্ক আর থাকে না। এইজন্য ব্যক্তি-'আমি'র প্রেম আমরা যেমন বুঝি, আত্মা-'আমি'র প্রেম তেমন বুঝি না; কোনরূপ স্বার্থ যাহার নাই সে যেন মানুষই নয়। এই প্রেম যেমন ব্যক্তিচেতনাযুক্ত,

তেমনই ইহা ব্যক্তির বা বিশেষের প্রতিই জন্মিয়া থাকে, তাই নির্বিবশেষের প্রেম যেন সোনার পাথরবাটি। ইহা খুবই সত্য ; তাই আমি আত্মার যে স্বাতন্ত্র্যবোধের কথা বলিতেছিলাম, তাহা এইরূপ প্রেমের অন্তরায় বটে। কারণ, আত্মার সেই বিশালতায় আত্মপর-ভেদ আর থাকে না—সকলই তাহাতে একাত্মীয়তা লাভ করে ; তখন পরেব তুলনায় বা পরের সম্পর্কে যত কিছু পীড়া তাহা নিজের বলিয়াই মনে হয়। তথাপি 'দুই'-এর চেতনা তাহাতেও থাকে, না থাকিলে—অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নির্বিবকল্প অবস্থায় —নিজের সেই আত্মার সম্বন্ধেও কোন বোধ থাকে না ; সেই বোধ থাকে বলিয়াই আর এক প্রকার প্রেমের অনুভূতি সম্ভব হয়। আত্মার যে আত্মমর্য্যাদাবোধ তাহাও বিশুদ্ধ অদ্বৈত-জ্ঞানে অসম্ভব, কারণ, সে অবস্থায় আত্মার আবার ভাব-অভাব কি ? অস্তি-ভাতি ছাড়া আর কিছুই তখন থাকে না।

অতএব বিবেকানন্দের সেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের সহিত যুক্ত যে প্রেম, তাহাই তাঁহার অদ্বৈত-জ্ঞানের একমাত্র দ্বৈত-সংস্কার, সে সংস্কারের একমাত্র কারণ তাঁহার স্বভাবের সেই অনমনীয় পৌরুষ। তথাপি বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত এইরূপ প্রেমের যোগ যে অসম্ভব নয়, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ও জীবনে দ্বৈতাদ্বৈতের এক অতি অভিনব সমন্বয় যেন মূর্ত্তি ধরিয়া সকল তর্কবিচারকে পরাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর, তাই আমাকে অন্যরূপ ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। বিবেকানন্দের সেই প্রেম আত্মার আত্মমর্য্যাদাবোধ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই বর্ত্তমান আলোচনায় বিশেষ কাজে লাগিবে। ওই প্রেমে মমতার বন্ধন নাই,

বাহিরের প্রতি কোন আসক্তি নাই ; উহার মূলে আছে আত্মাবমাননার গ্লানি হইতে নিজকে মুক্ত রাখিবার আকাঙ্ক্ষা। নিজে মুক্ত বলিয়া পরের বন্ধনদশায় উদাসীন থাকা, নিজে দুঃখকে অবস্তু জানিয়া পরের দুঃখকে অস্বীকার করা—ইহা পরের প্রতি নির্ম্মমতা নয়, নিজেরই আত্মার অবমাননা। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, অতএব জগতের চিন্তা জ্ঞানীর পক্ষে অনুচিত, যাহারা মায়ামুগ্ধ তাহারাই সে চিন্তা করিয়া থাকে—আমাদের দেশের বড় বড় ধার্ম্মিক সাধু ও সাধকগণের উক্তি এইরূপ। কিন্তু এই উক্তির যুক্তি অদ্ভুত ; জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে সেই জগতেরই একাংশে অবস্থিত এই ব্যক্তির অস্তিত্বও কি মিথ্যা নয়? তাহার মুক্তিচিন্তাও কি একটা মোহ নয়? বিবেকানন্দের যে অভিমান ছিল তাহা মুক্ত আত্মার অভিমান ; যে অন্তরে মুক্তি পাইয়াছে, তাহার আর সে-বস্তুর প্রতি লোভ থাকিবে কেন? তাই তাঁহার সেই ত্যাগ-বৈরাগ্য মুক্তিসাধনার বৈরাগ্য নয়—সে বৈরাগ্য অভয় হইবার জন্য নয় ; এজন্য বিবেকানন্দকে সাধারণ অর্থে সন্ন্যাসী বলাও যায় না। এ হেন পুরুষের পক্ষে, এক দিকে যেমন নিজের জন্য কোন ভয়, কোন চিন্তা নাই, তেমনই পরের দুঃখ পরের ভয় দেখিয়া অবিচলিত থাকাও সম্ভব নয়। 'আমি'র মুক্তিতেই জগতের মুক্তি—এমন কথা দেহধারী আত্মার পক্ষে মিথ্যা। দেহের সংস্কার যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ দ্বৈত-সংস্কার থাকিবেই ; ওই দ্বৈত-সংস্কারের মধ্যেই আত্মার যে অদ্বৈত-চেতনা তাহাই সর্ব্বভূতে-প্রীতির রূপ ধারণ করে। ইহাই সেই প্রেম, যাহাতে ব্যক্তির মমত্ববোধ নাই—আত্মার সর্ব্বাত্মীয়তাবোধ আছে। বিবেকানন্দ-চরিত্রের মূলতত্ত্ব—বীর্য্য বা পৌরুষ ; সে পৌরুষ জ্ঞান ও প্রেমের পৌরুষ, দুইটি [illegible] বস্তুর অপূর্ব্ব সমন্বয়! আমাদের শাস্ত্রে যাহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে

এ চরিত্র তাহাই। ভিতরে একেবারে মুক্ত বলিয়াই কোন বন্ধনকে ভয় পায় না; জন্ম ও মৃত্যুর পাত্রে যত বিষ-রস আছে এক চুমুকে পান করিয়া বলে, "এই দেখ্ আমার কি করিতে পারিল!" মহামায়া-রূপিণী প্রকৃতি দাসী হইয়া তাহার পদসেবা করে,— সে পুরুষ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করে। খাঁটি জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী,— বৈরাগ্যই তাহার জন্মগত সংস্কার; অথচ কি প্রাণ, কি প্রেম!

সংসার ত্যাগ ও তাহাকে বক্ষে ধারণ

বিবেকানন্দের ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছি, তথাপি একটা কথা বাকি থাকিয়া যায়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার এই প্রেমে মানব-হৃদয়ের আবেগ ছিল, সে প্রেম খাঁটি মানবীয় প্রেম। মমত্বের বন্ধন না থাকুক, তাহাতে মানুষের সহিত আত্মীয়তাবোধের মনুষ্যত্ব ছিল, কেবল আত্মার পৌরুষই নয়। তাহার কারণ, মানুষের দুঃখই ছিল এই প্রেমের সাক্ষাৎ জন্মহেতু; ওই দুঃখই দেহের ভূমিতে সেই আত্মাকে টানিয়া আনিয়া মানুষের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা ঘটাইয়াছিল। সকল তত্ত্বের পরম তত্ত্ব এই দুঃখ, প্রেমের তত্ত্বও তাহাই। বিবেকানন্দের সেই আত্মিক পৌরুষ এই দুঃখবোধের সহিত যুক্ত হইয়াছিল; সেই দুঃখের— সেই দেহচেতনার সমল সলিলে, পূর্ণবিকশিত হৃদ্‌পদ্মে, তাঁহার আত্মা যে আসন রচনা করিয়াছিল সে আসনের তলদেশে পঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহা পদ্মের বৃন্তমূলকেই দৃঢ় করিয়াছিল, পদ্মকে স্পর্শ করে নাই। মাটির সহিত আত্মার সংস্পর্শে ইহার অধিক আবশ্যক হয় না; দেহ-আত্মার

'ওইটুকু মিলন হইতেই মনুষ্যত্বের মৃণালে সেই প্রাণ-পদ্ম ফুটিয়া উঠে, যাহাকে আমি বিবেকানন্দের মত পুরুষের প্রেম বলিয়াছি। মনুষ্যত্বের যে পূর্ণতম বিকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানে ধরা দিয়াছিল ইহাও সেই প্রেম; বঙ্কিমচন্দ্র ইহারই একটা সাধন-পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দীক্ষামন্ত্রের সন্ধান দেন নাই; তিনি যজ্ঞের সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্ন্যাধান করেন নাই। বিবেকানন্দ এই আগুনের সন্ধান পাইয়াছিলেন—অল্প বয়সেই সংসারের প্রবেশ-দ্বারে জীবনের সেই হুতবহকে সাক্ষাৎ-দর্শন করিয়াছিলেন। সকল মানুষই দুঃখ পায়; কেহ নিরুপায়ভাবে সহ্য করে, কেহ ভুলিয়া থাকে বা দমন করে; অনেকে সুখসাধনায় জয়ী হইয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখে; কিন্তু দুঃখের স্বরূপ কয়জনের চক্ষে ধরা পড়ে? স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারে কে? যাহারা 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং' মনে করিয়া সংসার ত্যাগ করে তাহারা দুঃখের সে-রূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, তাহাদের আত্মা সঙ্কুচিত হইয়াছে—তাহাদের মনুষ্যত্বের মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃখই তাহাদের চক্ষে মৃত্যুর রূপ ধারণ করে—যজ্ঞের হুতবহ হইতে পারে না। দুঃখের সহিত প্রথম পরিচয়ে বিবেকানন্দও তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়াছিলেন; তখনও তাঁহার হৃদয়ের হবি হোমযোগ্য হইয়া উঠে নাই, তখনও তাহা ঢালিয়া দিবার মত তরলতা প্রাপ্ত হয় নাই; কারণ, তখনও জগতের বিশাল যজ্ঞভূমিতে, তাহার হোমানলশিখার প্রচণ্ড উত্তাপ সে হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তথাপি নিজেরই গৃহদ্বারে তাহার সেই মৃত্যু-রূপ দেখিয়া তিনি বিমূঢ় হন নাই; তাহার সেই মূর্ত্তি তাঁহার পৌরুষকে ব্যঙ্গ করিয়াছিল—সেই ব্যঙ্গ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাহার শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন; এবং শেষে মৃত্যুরূপী দুঃখের মুখ হইতেই,

বালক নচিকেতার মত, তিনি জীবনের অগ্নিক্ষেত্রে পূর্ণাহুতির মন্ত্র—সেই এক প্রশ্নের উত্তর—কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

আশ্চর্য্য এই দুঃখ! কারণ ইহাই যেমন চরম তথ্য, তেমন ইহাই আবার পরম সত্যেরও প্রবেশ-দ্বার। এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়—ইহারই অগ্নিতাপের পুটপাকে, ভাগ্যবান ও শক্তিমান মানুষের বজ্র-হৃদয় বিগলিত হয়, সেই বিগলিত হৃদয়ের নামই প্রেম; তাহাই আত্মার ধর্ম্ম—দেহযুক্ত আত্মার। বড় বড় তত্ত্ব বা অতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম ভাবরাজি যোগীর যোগসাধনার সহায় হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে জগতের সহিত, বাস্তব মানব-জীবনের সহিত, কোন সম্পর্ক নাই। সে সাধনাও 'ব্যক্তি'র সাধনা, 'আত্মা'র সাধনা নয়; কারণ, আত্মা প্রসারধর্ম্মী—সংকোচধর্ম্মী নয়। আশ্চর্য্য এই যে, ব্যক্তির আত্মসাক্ষাৎ-কার হয় ওই দুঃখের ভিতর দিয়া; যে যত শক্তিমান, অর্থাৎ যাহার হৃদয় যত বলিষ্ঠ, তাহার দুঃখ-বোধের শক্তিও তত অপরিমেয়—অভিভূত না হইয়া সেই আগুনের মধ্যেই তাহার চক্ষু স্থিরবিস্ফারিত থাকে, তাই চরম মুহূর্ত্তে দিব্য-দর্শন ঘটে। এই দুঃখ সাক্ষাৎ দেহচেতনাঘটিত—মস্তিষ্কজাত ভাবকল্পনার দুঃখ নয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার সাক্ষাৎ-অনুভূতি না হইলে আত্মায় তাহা পৌঁছে না। এ বিষয়ে একটি পুরাতন কবি-বাক্য মনে পড়িতেছে, যথা—

Who ne'er in weeping ate his bread,
Who ne'er throughout the night's sad hours
Hath sat in tears upon his bed,
He knows you not, Ye Heavenly Powers!

বিবেকানন্দের জীবনে অতিশয় সুলগ্নে এই দুঃখের দর্শনলাভ

ঘটিয়াছিল। পিতৃবিয়োগের ফলে, সেই অল্প বয়সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরে বৃহৎ সংসারের ভার পড়িয়াছিল; অতিশয় সচ্ছল অবস্থার পর হঠাৎ তাঁহারই মুখাপেক্ষী সেই অনাথ পরিবারের অনশন-সঙ্কট বিবেকানন্দের মত যুবকের পক্ষে কি তীব্র বেদনাময় হইয়াছিল, সেকালে তাঁহার আত্মীয়-পরিজনেরাও তাহা জানিতে পারেন নাই; অনেক পরে প্রসঙ্গবিশেষে তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহার একটু ধারণা করা যায়। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক সঙ্কট বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন—

One evening when he had eaten nothing, he sank down exhausted and wet through, by the side of the road in front of a house. The delirium of fever raged in his prostrate body. Suddenly it seemed as if the folds enveloping his soul were rent asunder, and there was light. All his past doubts were automatically solved. He could say truly: "I see, I know, I believe, I am undeceived..." In the morning his mind was made up. He had decided to renounce the world.

[একদিন সন্ধ্যাকালে বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ও সারাদিন অনাহারের পর, তিনি পথিপার্শ্বে, একটি বাড়ির সম্মুখে, নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন; তখন তাঁহার সেই ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ যেন একরূপ জ্বরের প্রদাহে সংজ্ঞাহীন। হঠাৎ চেতনা হইল—মনে হইল, যেন তাঁহার আত্মার শতপাক-বেষ্টনী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে আলোক প্রবেশ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এতদিনের দ্বিধা-সংশয় আপনাআপনি মিটিয়া গেল, তখন তাঁহার আর বলিতে বাধিল না—"আমি দেখিয়াছি, আমি জানিয়াছি, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমার নেত্র হইতে মোহজাল অপসারিত হইয়াছে!" পরদিন প্রভাতে তিনি কৃতনিশ্চয় হইলেন।...স্থির করিলেন যে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে।]

উপরের ঐ আলোক-দর্শন সম্বন্ধে মঃ রোলাঁ একটি মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এই—

Revelation came always by the same mechanical process at the exact moment when the limit of vitality had been reached, and the last reserves of the will to struggle exhausted.

ওই 'mechanical process' কথাটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু ওই নিয়ম কি সাধারণ মানুষের দেহতত্ব বা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সত্য? ওই 'vitality' এবং ওই 'will to struggle' যদি দেহ ও মনের ধর্ম্ম হয় তথাপি সে শক্তি চরম না হইলে তেমন চরম অবসন্নতাও ঘটে না—যাহার ফলে মানুষমাত্রের অন্তশ্চক্ষুতে ঐরূপ আলোক-দর্শন হয়। ঐ অবস্থায় ঐরূপ আলোক-দর্শন বুদ্ধের হইয়াছিল—কতখানি 'vitality' এবং কত বড় 'will to struggle' থাকিলে তবে দেহের অন্তিম অবস্থায় দেহাতীত প্রজ্ঞার এমন অপূর্ব্ব উন্মেষ হয়! ঠিক বুদ্ধের মত, বিবেকানন্দের সত্যদর্শন বা আত্মদর্শন এত শীঘ্র না ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু দুঃখের সহিত সংগ্রামে তাঁহার যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ শক্তিমান মানুষের পক্ষেও সুলভ নয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

উপরের ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে, তখনও দুঃখের সহিত যুদ্ধে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ জয়ী হইতে পারেন নাই—কারণ কেবল অন্তরের বৈরাগ্য বা ত্যাগ নয়, তিনি সংসারও ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখনও আত্মার আত্মাভিমানই বড়—প্রেম জাগে নাই। তথাপি সে সময়ের সেই সংকল্পের মধ্যে হৃদয়াবেগের লক্ষণই প্রবল; সেই বৈরাগ্য ও অভিমানপ্রসূত, তাহাতে স্পষ্ট বিদ্রোহের ভাব রহিয়াছে।

এই সময়ে, ও তাহার পরে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার সেই বিদ্রোহী-ভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আসল কথা, তাঁহার জীবনের এই ঘটনায় জ্ঞান ও প্রেমের একটা অতি কঠিন দ্বন্দ্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার চরিত্রের অপর দিকটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন, দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ব্যক্তি-আত্মার উচ্ছেদ একমাত্র উপায় হইলেও, তাহাতে প্রয়োজন কি? বরং ইহারই সংঘাতে আত্মা আত্মস্থ হয়, তাহার স্বরূপ-উপলব্ধি হয়—যদি আত্মার সেই শক্তি থাকে। তখন দুঃখের সেই অতল অকূল অশ্রুহ্রদে, ব্যক্তিত্বের বৃন্তটি মাত্র ধরিয়া আত্মার সহস্রদল সেই বারিরাশির উপরে খুলিয়া ঢলিয়া পড়ে, এবং প্রেমামৃতের মধু-সৌরভে মনুষ্য জীবনের দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়া উঠে। বিবেকানন্দের জীবনের সেই মহলিগ্নে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম-শীতল করস্পর্শ তাঁহার মস্তিষ্কের বহ্নিতাপ প্রশমিত করিল, অপার করুণার গভীর উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয়-নদী কূল হারাইল—সংসার ত্যাগ করিয়াই তিনি সংসারকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তখন বেদান্তের সেই নির্গুণ আত্মা-ব্রহ্মকেই তিনি 'কালী'রূপে জগৎময় উদ্ভাসিত হইতে দেখিলেন, ঘোর বৈদান্তিক, নির্ব্বিকল্প সমাধির পিপাসা যাহার কখনও ঘুচে নাই, কোন ঈশ্বরে যে কখনও বিশ্বাস করিবে না—সেও বলিয়া উঠিল ;—

The only God in whom I believe, is the sum-total of all souls, and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races…"

—কিন্তু সে কথা এখন নয়, পরে।

আমি সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের সহিত প্রেমের সম্পর্কের কথা বলিতেছিলাম,

প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিবেকানন্দের চরিত-কথা ও তাঁহার বাণী এক—তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অতএব সেই চরিত-প্রসঙ্গে তত্ত্বের কথা আপনি আসিয়া পড়ে;—পরে দেখা যাইবে, আমি গোড়া হইতে মূল তত্ত্বেরই অনুসরণ করিয়াছি। এই দুঃখ যে এক অর্থে অবস্তু নয়, এই দুঃখের যে-জ্ঞান সেই জ্ঞানই প্রেমের জনয়িতা—তাহা বলিয়াছি, আরও বলিবার আছে, এখানে তাহা প্রাসঙ্গিক হইবে না। এই দুঃখ যাহাদিগকে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী করে তাহারা বিবেকানন্দের মত পুরুষের সগোত্র নয়; আবার যাহারা ভাবযোগে সংসারকে, অর্থাৎ দুঃখকে, একটি পরম রসবস্তুর মত আস্বাদন করিয়া থাকে—সেই স্থূলভোগ-বিমুখ সূক্ষ্মভোগবিলাসী Epicureএর artistic monasticismও বিবেকানন্দের ধর্ম্ম নয়; ইহারাও আত্মপ্রেমিক Egoist—আত্মত্যাগী প্রেমিক নয়। ইহার পূর্ব্বেও পৃথিবীতে দুই মহাপ্রেমিকের আবির্ভাব হইয়াছিল— বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট; একজন জ্ঞানী-প্রেমিক, আর একজন ভক্ত-প্রেমিক। অতিরিক্ত ভক্তি (ভগবদ্ভক্তি) বাস্তব জগৎ ও জীবনের প্রতি বৈরাগ্যের কারণ হইয়া থাকে; খ্রীষ্ট ও চৈতন্য উভয়ে ভক্তির অবতার—চৈতন্য কিছু বেশি। ইঁহারা কেহই দুঃখকে বা জীবনের বাস্তবকে স্বীকার করেন নাই; বুদ্ধ করিয়াছিলেন,—এই দুঃখের জ্ঞানই তাঁহার বুদ্ধত্ব-লাভের কারণ; সেই জ্ঞানে তিনি ব্রহ্ম বা ভগবান কিছুই স্বীকার করেন নাই। বুদ্ধ সর্ব্বভূতের দুঃখ-নিবারণকল্পে যে মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—তাহাতে ব্যক্তি-আত্মাকে লোপ করিয়া আত্মা-মাত্রকেই অস্বীকার করিবার আবশ্যকতা ছিল। বুদ্ধের সেই বাণীই, পূর্ণতালাভ করিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব ব্রহ্মবাদে—আত্মাকে অস্বীকার করিয়া নয়, আরও পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া। সেইজন্যই

জগৎ একেবারে মিথ্যা বা মায়া নয়, দুঃখও 'অসৎ' নয়। শঙ্করের যে মায়াবাদ বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রায় নামান্তর, সেই মায়াই এবার—অবিদ্যা নয়, পরাবিদ্যার জননীরূপে দেখা দিল; কেবল জ্ঞান নয়, কেবল সন্ন্যাস নয়, কেবল প্রেমও নয়—সকলই এক নির্ব্বিরোধ উপলব্ধিতে অন্যোন্যসাপেক্ষ হইয়া উঠিল। বিবেকানন্দের অত্যুগ্র জ্ঞানপিপাসা যে-প্রেমের নিকটে আত্মসমর্পণ করিল—সেও জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা। কিন্তু, পূর্ব্বে বলিয়াছি, ওই প্রেমের বীজ তাঁহার স্বভাবে নিহিত ছিল—নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষের প্রতি একটা জন্মগত আকর্ষণ থকিলেও, তাঁহার রক্তের বাঙালীত্ব তাঁহাকে সহজে নিষ্কৃতি দেয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতেই এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তিনি নরেন্দ্রের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তজ্জন্য সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখিয়া কিছুমাত্র চিন্তিত হন নাই, বরং আশান্বিত হইয়া তাহার গতি-পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এবং শেষে নিজেই সেই স্বভাবের পূর্ণ-বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ ও গীতার কর্ম্মযোগ

বিবেকানন্দ-চরিত্রের যে দিকটি অসাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি এবং তাহার প্রসঙ্গে যে প্রশ্নের মীমাংসা এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রশ্নের আলোচনাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান; ইহার অন্তরালে ভারতীয় সাধনা ও মানবধর্ম্মের মধ্যে একটা নূতন বোঝাপড়ার ইঙ্গিত রহিয়াছে, এবং ইহারই মীমাংসায় সেই সাধনার ইতিহাসকে নূতন করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। বিবেকানন্দ যেন প্রাচীনের প্রতি নূতনেরই একটা বড় challenge। যুগে যুগে সেই একই তত্ত্বকে নব নব প্রশ্নের আঘাতে

ভাঙিয়া পুনঃস্থাপিত করা হইয়াছে—এমন ভাঙা-গড়ার যুগসন্ধি ভারতের ইতিহাসে আরও কয়েকবার আসিয়াছে ও গিয়াছে। এবারে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ভাবী মন্বন্তরের প্রতীক্ষায় একটা যুগ-বিপ্লব চলিয়াছিল, সেই যুগ-বিপ্লবের প্রায় শেষ তরঙ্গের উপরে এই যে আর এক আবির্ভাব, ইহা যে তদপেক্ষা বৃহত্তর ও গুরুতর মন্বন্তরের পূর্ব্বাভাস—সে কথা আজিকার দিনে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকেই যেটুকু অস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন, সেই অনুভূতির বলে ও এক প্রকার দৈবী দৃষ্টির সাহায্যে, যুগ ও সনাতনের—মনুষ্যধর্ম্মের ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মতত্ত্বের—তিনি যে সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাহা যেমন বুদ্ধি-সঙ্গত, তেমনই তত্ত্ববিরোধীও নয়; যুগধর্ম্মকে বুঝিবার ও সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবন-দর্শন এ জাতির উপযোগী করিয়া সে যুগে আর কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া যে গভীরতর সমস্যা, ও তাহার যে সমাধান-চিন্তা দেখা দিল তাহাতে, শুধু বর্ত্তমানের নয়—একটা দূরতর ও বিরাটতর ভবিষ্যতের ভাবনা যেন প্রবিষ্ট রহিয়াছে—সমগ্র মনুষ্যসমাজের আসন্ন মহাসঙ্কট যেন সে দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়াছে। ইহাই মনে রাখিয়া সেই পূর্ব্ব প্রশ্নের আর একটু অনুসরণ করিব।

আত্মার পৌরুষই, একাধারে বৈরাগ্য ও প্রেম—আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক ধর্ম্মসাধনার সহায়, হিন্দুর অধ্যাত্মবাদ বহু পূর্ব্বে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিল। ইহার একটা স্পষ্টতর অভিব্যক্তি, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধ তাহার পূর্ব্বে কি পরে—সে বিষয়ে মতভেদ হওয়া সম্ভব: কোন-কিছুর পূর্ণাঙ্গতা যদি কালসাপেক্ষ হয়, তবে গীতাকার বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, পরবর্ত্তী বলিয়াই

মনে হয়। বুদ্ধের জ্ঞানসর্ব্বস্ব ধর্ম্মনীতির উপরে পরবর্ত্তী কালে গীতার জ্ঞানমিশ্র ভক্তির প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়াই মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও অভ্যুদয় হইয়াছিল,, এরূপ মত প্রমাণসহকারে কেহ কেহ স্থাপন করিয়াছেন—যদিও বুদ্ধের পূর্ব্বগামিত্ব স্বীকার করেন নাই। সে যাহাই হউক, তত্ত্বের দিক দিয়া এই জগৎব্যাপারকে ও মনুষ্যজীবনকে গীতা যতটুকু মূল্য দিয়াছিল তাহার অধিক মূল্য পূর্ব্বে আর কোন শাস্ত্র দেয় নাই। তন্ত্রেও সেই এক তত্ত্বের সাধনায় যে নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে জগৎরূপিণী মহামায়ার উপাসনায় সৃষ্টিকে স্বীকার করিলেও—ত্যাগ ও ভোগ দুইয়েরই সমন্বয় থাকিলেও, সে সাধনা মুখ্যত ব্যক্তির সাধনা, তাহা সমষ্টিমুখী নয়। যে প্রেমের তত্ত্ব আধুনিক মানবধর্ম্মে একটা বড় তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ঠিক সেই তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কোন সাধনপন্থায় প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহা নিশ্চিত। আত্মা একাই সর্ব্ববিধ প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়—এই শ্রুতিবাক্য ভারতীয় সাধনাকে আত্মকেন্দ্রিক করিয়াছিল, উহার অর্থ সংকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন তত্ত্ব সহজেই বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, আত্মার দুর্ব্বলতাই জয়যুক্ত হয়, স্বার্থই আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে পরমার্থ হইয়া উঠে; শেষে সমাজ ও লোকস্থিতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ কোন সঙ্কটকালে গীতার আবির্ভাব হইয়াছিল; সেই আত্মার গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়াই—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়মূলক এক নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল; ইহাদ্বারাই ব্যক্তির আত্মহিত ও সর্ব্বভূতের হিত, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার ফল সে যুগে হয়তো ভালই হইয়াছিল—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য মিলিতে পারে। কিন্তু পরে সেই ধর্ম্ম যে ভারতীয় সমাজকে রক্ষা করিতে পারে নাই—

তাহার প্রভাব যে নানা লোকধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে মন্দীভূত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। একদিকে বেদান্তের সেই 'ব্রহ্মপদ' এবং বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ' যেমন তাহা দ্বারা নিরস্ত হয় নাই, তেমনই মানুষের স্বভাবধর্ম্মের প্রতিকূল সেই শূন্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদের পীড়নে তাহার 'মহাপ্রাণী' অসুস্থ হইয়া পড়িল, এবং আত্মতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব উভয়কেই বিকৃত করিয়া, নানা অনাচার ও কদাচারের পর যখন আত্মার পৌরুষ প্রায় লোপ পাইয়াছে তখন দিকে দিকে ভক্তিরসের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল, ও তাহারই নেশায় কর্ম্মবিমুখতার ছদ্মবৈরাগ্য বড় প্রশ্রয় পাইল ; জীবনের সহিত মুখামুখী দাঁড়াইয়া তাহাকে জয় করিবার প্রয়োজন আর রহিল না। সেই উপনিষৎ ও সেই গীতা তখনও টিকিয়া আছে, কিন্তু টাকাভাষ্যের ভস্মলেপন অথবা পুরাণ-উপপুরাণের রসসিঞ্চন তাহাকে আর এক বস্তুতে পরিণত করিল; তাই আমাদের মধ্যযুগের ইতিহাসে জাতিহিসাবে পৌরুষের সাধনা প্রায় লোপ পাইয়াছিল।

উপনিষৎ বেদান্ত ও গীতার প্রভাব প্রাচীন ভারতের সমাজে ও ধর্ম্মে কোন না কোনরূপে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া আসিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী যুগে সেই তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তিরস যুক্ত হইয়া আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের পত্তন হইয়াছিল—ইহা স্মরণে রাখিয়াও, আজিকার এই যুগের হিন্দুসমাজে একমাত্র গীতারই প্রসার ও প্রতিপত্তি আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া মনে হয়, ওই একখানি গ্রন্থেই সর্ব্বযুগের উপযোগী এমন কোন সত্য আছে, যাহার জন্য আজিকার এই ভাববিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবের দিনে, উহারই মধ্যে একটা আশ্রয়ের ভরসা, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে প্রায় সকলেই পাইয়া থাকে। ইহাও সত্য যে, এমন কোন তত্ত্ব-বিচার নাই যাহার প্রসঙ্গে গীতার কোন না কোন শ্লোক উদ্ধৃত

করিয়া পরকে চমৎকৃত ও নিজেকে আশ্বস্ত করা না যায়। অতএব গীতার সেই বাণীগুলির মধ্যে একটা চিরন্তনতা আছে—সর্ব্বকালের সর্ব্ববিধ মানবচিত্তের সুপথ্যস্বরূপ বহু মহাবাক্য তাহাতে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এমন ধর্ম্মগ্রন্থও ভারতীয় সমাজের জীবন-বেদ হইয়া উঠিতে পারে নাই ; ভাষ্যের পর ভাষ্য রচনাই হইয়াছে, এখনও হইতেছে, কিন্তু তাহা দ্বারা এ দেশের এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম্মের তথা কর্ম্মের ঐক্য স্থাপন হয় নাই, হইলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। ইহার কারণ, গীতায় আত্মতত্ত্বই প্রধান হইয়া আছে—মানুষের জীবন বা খাঁটি মনুষ্যত্ব বলিতে আমরা যাহা বুঝি, আত্মার সম্পর্কে তাহার যে মূল্যই তাহাতে স্বীকৃত হউক না কেন—তাহাতে মানুষের প্রাণ সাড়া দেয় নাই। গীতার যে কর্ম্মসংন্যাস তাহাতে সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও তাহা সন্ন্যাসই বটে ; মায়াবাদ সেখানেও প্রবল। গীতায় পরহিতব্রত বা সর্ব্বভূতে আত্মৌপম্যবোধের যে প্রেম, সে প্রেমও একমুখী, বহুমুখী নয় ; তাহাতেও চিত্তকে সেই একের উপরে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। অতএব গীতায় সন্ন্যাস ও মানবপ্রেমের সমন্বয় হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। সেখানে মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহা সেই এক 'আত্মা'র প্রতি শ্রদ্ধাই বটে ; কিন্তু সেইজন্যই দুঃখও মিথ্যা, তাহা আত্মার দেহাভিমান-প্রসূত—প্রথম হইতেই ইহাও উপলব্ধি করিতে হইবে। আমি ও পর যখন একাত্ম, তখন পরের দুঃখ বলিয়া যেন কোন পৃথক দুঃখ নাই—আমার জ্ঞানে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে, বাহিরেও তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। ইহা পরম তত্ত্ব বটে, কিন্তু ইহা জগতের বাস্তব তথ্য নহে : সেই বাস্তবকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে থাকে কেবল

'আমার'ই ব্যক্তি-সত্তা। সমস্ত বহির্জগৎ, সংসার, সমাজ আছে এবং নাইও; যেটুকু আছে সে যেন আমারই মোক্ষসাধনার যন্ত্ররূপে। নিষ্কামভাবে সর্ব্বভূতের হিতসাধনা করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উহার দ্বারা অদ্বৈত-জ্ঞান আরও দৃঢ় হইবে, নিস্পৃহভাবে মায়ার সেবা করিতে পারিলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইবে। পুরুষ এখানে আসলে একা, রঙ্গমঞ্চে সেই পুরুষ ছাড়া আর কেহই নাই, আর সকলেই ছায়ামূর্ত্তি; তাহাদের সহিত অভিনয় করিয়া, অর্থাৎ অকর্ম্ম জ্ঞানে সকল কর্ম্ম করিয়া, পঞ্চমাঙ্কে যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষের মুক্তিলাভ হইবে। আমি গীতা-তত্ত্বের এই যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই যে গীতার সমগ্র তত্ত্ব নয়, ইহা বলিবার জন্য গীতাপন্থী মহাজনগণ সকলেই উন্মুখ হইবেন তাহা জানি; তাঁহাদের এক উত্তর এই যে, গীতায় সকল তত্ত্বই আছে, এবং একটি মূল তত্ত্বে সেগুলি সমন্বিত হইয়াছে। এ কথা হয়তো সত্য যে, সকলের সকল রকমের পিপাসাই গীতায় মিটিতে পারে, কিন্তু ওই সমন্বয় যদি সত্যই হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আজও এত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইত না। গীতা এই সৃষ্টিকে—এই প্রকৃতি বা মায়াকে—স্বীকারও করে, অস্বীকারও করে; সে যেন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'; আসলে তাহার মূলে আছে সেই বৈদান্তিক মায়াবাদ, বহু শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট ঘোষণাও আছে; বরং তাহার সেই সমন্বয়চেষ্টাই অতিশয় সংশয়পূর্ণ।

উপরের কথাগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি গীতার নিন্দা করিতেছি; গীতার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মদর্শনের সমালোচনা করিব, এমন স্পর্দ্ধা আমার নাই; বরং ধর্ম্মগ্রন্থহিসাবে তাহাকেই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আমি তাহার নিত্য পূজা করি। কিন্তু মানুষ আমি,

মনুষ্যসাধারণের সহিত একযোগে আমি যে সংস্কারের অধীন তাহার শেষ কণাটুকু ত্যাগ করিবার মত আত্মজ্ঞান এখনও লাভ করি নাই, যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ—বিশেষত এই ভারতবর্ষের ভাবুক মনীষিগণ দুঃখকে একটা বড় তত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন; আরও প্রাচীন কালে ব্রহ্মজ্ঞানের যে আনন্দবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অভাবে সেই ব্রহ্ম ও তাহার তত্ত্ব মন্ত্ররূপে আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, ক্রমেই জীবনের বাস্তব-অনুভূতি অন্তরের সেই সহজ আনন্দবোধকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু তখনও সকল তত্ত্বই আত্মানুভূতি-মূলক ছিল, আত্মোপলব্ধিই ছিল পরম পুরুষার্থ—জ্ঞানই ছিল একমাত্র প্রস্থান। প্রেমের পথ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এদিকে জীবনের সহিত পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃত হইতে লাগিল, অর্থাৎ দুঃখ যত বাড়িয়া উঠিল, এবং তাহাকে উড়াইয়া দিবার মত সেই আদিম প্রাণশক্তি যত কমিয়া আসিতে লগিল, ততই তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি-কামনায় নানা সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতে লাগিল। শেষে দুঃখদর্শনে পুরুষের প্রাণের যে গভীর অনুকম্পা, তাহার অবতারস্বরূপ ভগবান বুদ্ধের অবির্ভাব হইল, সেই অনুকম্পার বশে তিনি দুঃখকে নস্তাৎ করিবার জন্য 'আত্মা'কেই বিনাশ করিতে চাহিলেন। এ পর্য্যন্ত জ্ঞানই ছিল একমাত্র পন্থা; এই পন্থার মধ্যস্থলে মহর্ষি কপিল এমন একটি প্রস্তরখণ্ড দৃঢ়প্রোথিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য কাহারও হয় নাই; উপনিষদের সেই ব্রহ্মবাদকেও তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতে হইয়াছিল, গীতাই তাহার দৃষ্টান্ত—"সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" এ কথা তাহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে।

কিন্তু গীতাই সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছিল—জ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই ভক্তিকে এমন আসন তৎপূর্ব্বে আর কেহ দিতে পারে নাই। কপিলের নিকট হইতে ভূত-বিজ্ঞান এবং উপনিষদের নিকট হইতে অধ্যাত্মবিজ্ঞান আহরণ করিযা, এমন একটি তত্ত্বের দ্বারা সে উভয়ের যোগসাধন করিয়াছে যে, জ্ঞানই তাহাতে সমৃদ্ধ হইয়াছে; সাংখ্যের সেই দ্বৈতবাদ—সেই পুরুষ-প্রকৃতি—এক অদ্বৈতরূপী পুরুষোত্তমের আলিঙ্গন-পাশে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া উঠিযাছে; সেই এক আত্মাই দুই হইয়া এক অপরকে বলিতেছে—"মন্মনা ভব মদভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"! কপিলের সেই দুঃখ-ভয় আর ইহাতে নাই, কারণ সেই 'আমি'ই 'আমাকে' বলিতেছে—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"। গীতায় জ্ঞানের যথাযোগ্য স্থান আছে, কিন্তু তাহা ভক্তি-শাসিত; Mind-ও আছে, Heart-ও আছে, কিন্তু সেখানে—"Heart is the Mind's Bible"। এই ভক্তিবাদই ভারতীয় সাধনায় গীতার শ্রেষ্ঠ দান—যদি প্রকৃত সমন্বয় কোথাও কিছু হইয়া থাকে, তবে সে এইখানে; এরূপ সমন্বয়, মানুষের জীবন-সাধনায় নয়—অধ্যাত্ম সাধনাতেই সম্ভব ও সত্য।

কিন্তু গীতার যাহা অপর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব, যাহার জন্য আমরা গীতাকে একটি খুব practical (বাস্তব) ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া থাকি—তাহার যে 'কর্ম্মযোগ'-শিক্ষায় জীবনের একটা বড় সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহার সেই তত্ত্ব মানুষের প্রাকৃত জীবনে সত্য হইতে পারে নাই—জীবন-ধর্ম্মের সহিত তাহার সমন্বয় সম্ভব নয় বলিয়াই তাহা তত্ত্বগত হইয়া আছে, তথ্যগত হয় নাই। গীতার প্রধান ভাষ্যগুলির দিকে দৃষ্টি করিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে; জ্ঞানপন্থী বা ভক্তিপন্থী

কোন আচার্য্যই গীতার ওই কর্ম্মযোগকে স্বীকার করেন নাই—শুধুই কর্ম্মফল-ত্যাগ নয়—কর্ম্মত্যাগেরই ওকালতি করিয়াছেন। ইহার কারণ জ্ঞান-ভক্তির পথ ও এইরূপ কর্ম্মের পথ যেন কিছুতেই মিলিতে চায় না—একটি যেন অপরের বিপরীত; তাহারও কারণ—তুইয়ের জগৎই স্বতন্ত্র, একটি প্রবৃত্তির, অপরটি নিবৃত্তির। গীতায় একটা অসাধ্যসাধনের চেষ্টা হইয়াছে; গীতাকার যতই তাহা সম্ভব বলিয়া উপদেশ করুন না কেন, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই যেন আপন আপন পথে ওই কর্ম্মকে একটা বাধা বলিয়াই মনে করে, সাধনার গতিবেগে তাহারা উহাকে এড়াইয়া যাইতে চায়। সত্য বটে, সেইজন্যই গীতায় বার বার জ্ঞানের উপরে ভক্তিকেই বড় করা হইয়াছে; কারণ, ভগবানে সর্ব্ব-সমর্পণ ব্যতিরেকে এমন 'মৎকর্ম্মপরম' হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা আত্মকর্তৃত্ব নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়া, কোন কর্ম্ম করা সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ 'যোগযুক্ত' হইয়া কর্ম্ম করা কি মনুষ্যপ্রকৃতির পক্ষে সম্ভব? কয়জন মানুষ এমন অতি-মানুষ হইতে পারে? যাহারা হয়, তাহাদিগকে বুঝিতে পারেন কয়জন? অতএব তাহাদের সেই জীবনকে আদর্শরূপে বরণ করিতেও সাধারণ লোকে পারে না,—মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়াই পারে না। কর্ম্ম কেবল ভাব বা জ্ঞানমূলকই নয় তাহা প্রবৃত্তিমূলক; সেখানে কেবল knowing ও feeling (জ্ঞান ও অনুভূতি) লইয়াই কারবার নয়—willingও (আকূতি) চাই। এই will-এর (আকূতি) অপর নাম—কাম। কর্ম্ম করিতে হইবে অথচ কামকে উচ্ছেদ করিতে হইবে, ইহা মনস্তত্ত্বের তথা জীবন-সত্যের বিরোধী—অর্থাৎ দেহাধিষ্ঠিত আত্মার পক্ষে, মনুষ্যনামধারী পুরুষের পক্ষে, ইহা অসম্ভব। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় যে ক্ষেত্রে সম্ভব, কর্ম্মের ক্ষেত্র তাহা হইতে স্বতন্ত্র; সেখানে, জ্ঞান ও

ভক্তির প্রেরণাসত্ত্বেও, 'প্রবৃত্তি'হীন' হইয়া কর্ম্মে 'প্রবৃত্ত' হওয়া মানুষের পক্ষে অসাধ্য। ভক্ত বলিবেন, ভগবানের কর্ম্ম করিতেছি, এই জ্ঞানে কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া থাকে, এবং তাহার সহিত যদি জ্ঞান যুক্ত হয তবে আসক্তিও থাকিবে না। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, ওই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম কোনটাই জগৎ-মুখী নয়, সকলই ভগবৎ-মুখী; ওই ভক্তিও যেমন সংসার-বৈরাগ্যের ভক্তি, ওই জ্ঞানও তেমনই বৈরাগ্যযুক্ত—ইহার কোনটার দ্বারা প্রকৃত কর্ম্ম—প্রকৃত জগৎ সেবা হয় না। কর্ম্মের যে 'কর্ত্তা' সে 'আমি'ই; ভগবানের নামে হইলেও কর্ম্ম 'আমার'ই; মানুষ যখন ভগবানের নামে কোন কর্ম্ম করে, তখনও তাহাতে একটা স্বকীয় প্রবৃত্তি থাকিবেই। এই প্রবৃত্তিকে হনন না করিয়া শোধন করিয়া লইতে হইবে; সেই পরিশুদ্ধ প্রবৃত্তির নাম—প্রেম। শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নিষ্কাম হইবার প্রয়োজন নাই, তাহার প্রবৃত্তির মূলে প্রেম থাকিলেই হইল—জ্ঞান ও ভক্তি তাহার সাহচর্য্য করিবে মাত্র। কিন্তু দুঃখকে—জগৎ ও জীবনকে—স্বীকার না করিলে ওই প্রেমের জন্ম হয় না, তাই এতকাল পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বে মানব-প্রেমের স্থান অতিশয় সংকীর্ণ ছিল—আত্মার সত্যকে আমরা জীবনের সত্যের সহিত ভাল করিযা মিলাইয়া লইতে পারি নাই। অথচ, সেই অতিপুরাতন তত্ত্বের মধ্যেই যে ইহার বীজ নিহিত ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-মন্ত্রে ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা তাহারই প্রমাণ পাইয়া বিস্মিত হইয়া থাকি। সেই বাণীতেই মানুষের ও আত্মার, জগৎ ও ব্রহ্মের, এক অপূর্ব্ব সমন্বয় মানুষেরই বুদ্ধিগোচর হইয়াছে; তাহা যে এতকাল পরে, ঠিক এই যুগেই ঘটিয়াছে, ইহাও পরমাশ্চর্য্যের বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণের 'কালী' এই সমন্বয়ের প্রতীক,—নরেন্দ্রের সেই জ্ঞানকেই অতিশয় সুলক্ষণযুক্ত দেখিয়া তিনি এই 'কালী'র মন্দিরে

তাহাকে বলিরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এবার শুধুই জ্ঞান ও ভক্তি নয়—জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়; তাই কর্ম্মও তাহার এমন অনুকূল হইয়াছে।

প্রেম ও বৈরাগ্য

বিবেকানন্দের জীবনে যে-প্রেম জ্ঞানের সহিত অবিরোধে বাস করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ এখনও শেষ হয় নাই, সম্ভবত একেবারে শেষ হইবে না; কারণ ইহারই তত্ত্ব বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি তাঁহার মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের যে সাম্যাবস্থার কথা বলিয়াছি তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ এত বড় প্রেম সত্ত্বেও সে জীবনে জ্ঞানের সহিত তাহার একটা বিরোধ কখনও ঘোচে নাই; সকলেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অশান্তির অস্থিরতা ছিল, তাঁহার আত্মার সেই অমিত বীর্য্য আপনাতে আপনি সমাহিত হইয়া থাকিতে পারে নাই,—তিনি সারাজীবন একটা প্রবল উত্তেজনা ও কর্ম্মব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহারই দাহে তাঁহার দেহ অকালে ভস্মীভূত হইয়াছিল। মঃ রোলাঁ বড় সত্য কথাই বলিয়াছেন—

His super-powerful body and too vast brain were the predestined battlefield for all the shocks of his storm-tossed soul··· And his days were numbered. Sixteen years passed between Ramakrishna's death and that of his great disciple—years of conflagration. He was less than forty years of age when the athlete lay stretched upon the pyre.

ইহার কারণ, প্রেম তাঁহার সেই অপর প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে নাই, অতিশয় দৃঢ়বলে শাসনে রাখিয়াছিল ; তাহার জন্য নিরন্তর যে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল—নিজের সহিত নিজেই যে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহার প্রচণ্ডতাই সে জীবনকে এমন দীপ্যমান করিয়াছে। তথাপি জ্ঞান ও প্রেম দুই-ই তাঁহার উপরে সমান আধিপত্য করিয়াছিল —একটা ভিতরে, অপরটা বাহিরে, তাই সে দ্বন্দ্ব এমন অন্তর্গূঢ় হইয়াছিল। এই প্রেমও যে সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে শাস্তির মত বোধ হইত, এবং ভিতরের কি একটা শক্তির বশে সে শাস্তি তিনি যেন বহন করিতে বাধ্য,—এমন ভাবও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতাই এক স্থানে লিখিয়াছেন—

It seemed almost as it were by some antagonistic power that he was "bowled along from place to place being broken the while," to use his own graphic phrase, "Oh, I know I have wandered over the whole earth," he cried once, "but in India, I have looked for nothing save the cave in which to meditate!"

কিন্তু সন্ন্যাসী-বিবেকানন্দের এই দীর্ঘশ্বাসে প্রেমিক-বিবেকানন্দের পরিচয় কি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে না ? যে শান্তি তাঁহার এত কাম্য, যে জীবন তাঁহার এত প্রিয়, তাহাই তো তিনি ত্যাগ করিয়াছেন ! এই ত্যাগের শক্তি আসে কোথা হইতে ? প্রেম ও বৈরাগ্য এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তাঁহার জীবন জীর্ণ হইলেও তিনি ওই প্রেমেরই যজ্ঞানলে সেই জীবনকে আহুতি দিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবেকানন্দের অসাধরণত্ব—আত্মপ্রেম বনাম মানবপ্রেম

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে দীক্ষালাভ করিবার পূর্ব্বে বিবেকানন্দ তাঁহার স্বভাবের ভিতরকার এই বিরোধকে স্বীকার করিতে না। চাহিলেও অস্বীকার করিতেও পারেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম হইতেই তাঁহার চরিত্রের এই অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সে অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সেই পৌরুষ-বীর্য্যে; তাঁহার অন্তরের সিংহমূর্ত্তির সেই স্ফুরিত কেশরদাম গুরুকে চমকিত ও চমৎকৃত করিয়াছিল। যে আত্মার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য", ইহা সেই আত্মার সেই পৌরুষ, তাই ইহা মৃত্যুঞ্জয়, মায়াজয়ীও বটে। কিন্তু মায়াকে জয় করিতে হইলে তাহাকে হনন করিতে হয় না—সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া আত্মার ইস্টসাধন করা যায়। যে-প্রেম সেই মায়ার—সেই ছলনাময়ী প্রকৃতির—বন্ধনপাশ, তাহাই দুর্ব্বলতা, তাহাই মোহ; সে-প্রেম দুঃখকে জয় না করিয়া তাহার অধীন হয় বলিয়াই দুর্ব্বল আত্মার পক্ষে পলায়ন অথবা আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। এই দুঃখকে—কপিল-বুদ্ধের মত—কোন অর্থেই 'অসৎ' বলা যাইবে না; এই দুঃখচেতনা হইতেই অস্তিত্বের চেতনা—জীবন-চেতনা; এই দুঃখ হইতেই মর-জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই প্রেমের জন্ম হয়। জীবন ও জগৎ যদি দুঃখহেতু বলিয়া 'অসৎ' হয়—সেও দুর্ব্বল আত্মার মোহ, একরূপ অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি; সেরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানের অভিমান

আত্মার আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। বরং ওই জগৎকে ওই দুঃখকে সেই এক 'সৎ'-বস্তুর অনুগত করিয়া দেখিতে পারিলেই প্রকৃত অদ্বৈত-সিদ্ধি সম্ভব। বিষ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহার সঙ্গে বিষঘ্ন ঔষধও রহিয়াছে ; শুধু তাহাই নয়, যে প্রেমের শক্তি দুঃখকে নির্বিষ করিয়া তোলে তাহারও জন্ম হয় ওই দুঃখ হইতে ; ওই প্রেম পূর্ণ জ্ঞানেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, অতএব উহাও 'সৎ'—অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে না। দুঃখকে আমরা যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি—সে সম্বন্ধে আমাদের যে সংস্কার—আমাদের অজ্ঞান ও অশক্তিই তাহার কারণ।

গীতা বলিয়াছেন—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ", আত্মার দ্বারাই আত্মাকে তুলিয়া ধরিবে, আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না ; "আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"—আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। ইহার অর্থ, আত্মার মোহই সকল ভয় ও সকল অশক্তির মূল—মোহমুক্ত আত্মার ভয় কি ? তাহার মত শক্তিমান কে ? সে অবস্থায়, পারমার্থিক হিসাবে জগৎ যাহাই হউক—ব্যবহারিক হিসাবে তাহা সত্য হইলেও ক্ষতি কি ? তখন 'আমি'ই একমাত্র সত্য বলিয়া আর সকলেই মিথ্যা নয় ; বরং সেই 'আমাতে'ই সকলে অবস্থান করিতেছে —ওই 'বহু'ও আমারই 'আমি', এই জ্ঞান দৃঢ় হইয়া থাকে। সেই আত্মজ্ঞানে যখন বুঝি, আমি কে—আমিই বিরাট ও বিশ্বম্ভর, তখন আমার যে আত্মস্ফূর্তি হয়, তাহা ক্ষুদ্র-আমির আত্মম্ভরিতা নয়—আত্ম-বিস্ফারের আনন্দ ; এই আনন্দময় আত্মবিস্ফারের অনুভূতিই জগৎ-অনুভূতি। আমি 'এক'ও বটে আমি 'অনেক'ও বটে—আমার বিভূতির কি সীমা আছে ? দ্বৈত ও অদ্বৈত—দুই তত্ত্বই এক ; যেখানে বিরোধ-বোধ আছে সেখানে আত্মারই আত্মজ্ঞানের অভাব—তাহাই মোহ,

তাহাই অবিদ্যা। অতএব জগৎকে অস্বীকার করিবার যে জ্ঞানবিজৃম্ভিত মনোভাব তাহাও অজ্ঞান আত্মার আত্ম-সঙ্কোচ। অদ্বৈত হইতে দ্বৈতে—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতে, আত্মার এই গতায়াত আত্মারই "যোগমৈশ্বরম্"।* ইহা যদি দুঃখপ্রসূ হয়, তবে দুঃখও এই হিসাবে সত্য যে, তাহা আত্মার সেই অনন্ত শক্তিকে প্রেমরূপে আস্বাদন করিবার একটি সহায়। আমারই এতগুলি 'আমি' দুঃখ পাইতেছে—নিজের প্রতি নিজেরই এই অনুকম্পা, ইহাই সেই 'রস'—যাহা অভিনয়ের দ্বারা আস্বাদন করিবার জন্য আত্মা এই জগৎরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। এ অভিনয় অনন্তকাল চলিয়াছে ও চলিবে। এ দুঃখ আমারই দুঃখ—সর্ব্বশক্তিমান, নিত্যমুক্ত স্বাধীন যে-'আমি' সেই 'আমি'র দুঃখ, তাই সেই দুঃখ, পাপীর দুঃখ নয়—সেই দুঃখীও দয়ার পাত্র নয়। এই দুঃখকে অস্বীকার করিয়াও স্বীকার করিতে হয়—নতুবা, যে নিত্যমুক্ত তাহার আবার দুঃখ কি? ওই প্রেমের কারণেই 'আমি'গুলির দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠে; সেই দুঃখশৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য যে অধীর আবেগ, তাহার মূলে আছে যেমন আত্মপ্রেম, তেমনই তাহা মানব-প্রেমও বটে। আত্মার এই শক্তি, তথা আনন্দ ও প্রেমের তত্ত্ব, অতি প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বই বটে—গীতার তত্ত্বও মূলত ইহাই; কেবল এই ভাষ্য নূতন,—শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে ও বিবেকানন্দের জীবনে সেই ব্রহ্মসূত্রের—সেই আত্মোপনিষদের-এক অভিনব মানব-ভাষ্য প্রণীত হইয়াছে; নবযুগের নবধর্ম্মের অন্তর্গত সেই পাশ্চাত্য Humanism-কে (মানবতাবাদকে) একটি অতিগভীর তত্ত্বের আলোকে উজ্জ্বল ও পরিশুদ্ধ করা হইয়াছে।

ত্যাগী সন্ন্যাসীও যে কি কারণে কিরূপ প্রেমিক হইতে পারে আমার সাধ্যমত তাহার আলোচনা একটু বিস্তৃতভাবেই করিলাম। এই প্রেম,

যে জ্ঞানের অন্তরায় নয়; আত্মার আত্মজ্ঞানের পৌরুষ ও এই প্রেম যে এক বস্তু; এই সন্ন্যাসও যে প্রাচীন বা মধ্য যুগের সেই সন্ন্যাস নয় —ইহাতে জগৎ-সত্যকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজনও যেমন নাই, তেমনই আত্মার বন্ধন-ভয়ও নাই; —বিবেকানন্দের চরিত্র ও জীবন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেই অদ্বৈতজ্ঞানী, আত্মৈকবিশ্বাসী, কর্ম্মবীর্য্যা-বতার সন্ন্যাসী আপন মনুষ্যহৃদয়যোগে যে বন্ধনকে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণের পূর্ণস্ফূর্ত্তি ছিল, মনের মোহ ছিল না। কিন্তু জ্ঞানের সহিত প্রেমের এই যোগ-সাধন, অথবা জ্ঞানের অন্তস্তলে এই প্রেম-বীজের আবিষ্কার যে দৃষ্টির দ্বারা হইয়াছিল, তাহাকে সেই দৃষ্টির সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে না—কখনও করিত কিনা সন্দেহ, সে সহসা এমন এক প্রেমকে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করিল—যাহা জ্ঞানেরই যেন বিগলিত রূপ। সে-রূপ দেখিয়া তাহার চিত্তে ব্রহ্ম ও মানবের ভেদজ্ঞান আর রহিল না, জ্ঞান ও প্রেমের এই অদ্বৈত-সিদ্ধি তাহাকে চিরজীবনের মত জয় করিয়া লইল। এমনই করিয়া বাংলার এক অখ্যাত পল্লীর নিভৃত মন্দির-প্রাঙ্গণে, ভারতবর্ষের সেই চিরাগত সাধনাই—এখনও যাহা অনাগত, তাহাকে বরণ করিয়া লইল; সেই এক গঙ্গোত্তরী-ধারার জাহ্নবী-তীরে সমগ্র মানব-জগতের জন্য এক নূতন বারাণসীর প্রতিষ্ঠা হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনতত্ত্বের মৌলিকতা

বিবেকানন্দের সেই দীক্ষালাভ ঠিক কোন্ ক্ষণে কি উপায়ে হইয়াছিল সে রহস্য চিরদিন আমাদের অজ্ঞাত হইয়াই থাকিবে। তিনি গুরুর অপর কোন্ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহার সারাজীবন

শান্তিময় ধ্যানের পরিবর্ত্তে একটা অশান্ত কর্ম্ম-ব্যাকুলতায় নিঃশেষ হইয়াছিল,—সে কথা তিনি নিজেও প্রকাশ করেন নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "It is a secret, that will die with me" অর্থাৎ, "সে কথা আমি ভিন্ন আর কেহ জানিবে না।" সেই ধীর, শান্ত, সহাস্য, ক্ষণে-ক্ষণে সমাধিস্থ, ভাববিহ্বল, আত্মানন্দী পুরুষের সেই যে পরমহংস-রূপ আর সকলে প্রত্যক্ষ করিত, তাহার অন্তরালে কোন্ অপর মূর্ত্তি কূটস্থভাবে বিদ্যমান ছিল? সেই বাহ্যিক প্রশান্তি ও পূর্ণ স্থিরতার মধ্যেই কি প্রচণ্ড গতিবেগ লুক্কায়িত ছিল, যাহার একটুও স্পর্শে বিবেকানন্দের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব পরাস্ত হইয়াছিল—অন্তরের শান্তিপিপাসার উপরে বাহিরের সংগ্রাম-বাসনা জয়ী হইয়াছিল? তাঁহার জীবনে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা যে সেই গুরুদীক্ষার ফল, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই; গুরুর যে দিকটি লোকচক্ষুর অগোচর ছিল, সেই দিকটি তাঁহার মধ্য দিয়াই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেই দিক যে কিরূপ, তাহা বিবেকানন্দ হইতেই আমরা জানি: কেবল এই সংশয় কিছুতেই ঘোচে না যে—সেই দিক কি সত্যই দক্ষিণেশ্বরের সেই কোমল-দেহ ও কোমল প্রাণ, সংসারভীরু, বিবিক্তসেবী, জগৎব্যাপারে অনভিজ্ঞ, উদাসীন নির্লিপ্ত ভাবনিমগ্ন পুরুষেরই অপর দিক? তাঁহার যে মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা সেই 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'; আর এ মূর্ত্তি শক্তির প্রকট মূর্ত্তি, এ মূর্ত্তি আর কেহ দেখে নাই, বিবেকানন্দই দেখিয়াছিলেন। তিনি যে-শিবের আদর্শকে বিশুদ্ধ অদ্বৈত-তত্ত্বরূপে বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, পরমহংসদেবের মধ্যে তিনি সেই শিবেরই অপর রূপ দেখিয়া—দ্বৈতাদ্বৈতের অভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া—সর্ব্বসংশয়মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যে তত্ত্বের মূর্ত্ত বিগ্রহ, সেই

তত্ত্বই জগৎকে—সৃষ্টিকে—একটি নূতন অর্থে যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, মানবজীবনকে একটা নূতন মহিমা দান করিয়াছে। সেই তত্ত্বের দার্শনিক সমস্যা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। তথাপি আমার নিজের মত করিয়া ওই তত্ত্বের একটু ব্যাখ্যা করিব।

জীবনকে তথা সৃষ্টিকে 'সৎ' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, সৎ-অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, এক ও অনেক, স্থিতি ও গতি, ধ্রুব ও অধ্রুব প্রভৃতি 'দ্বন্দ্ব' বা 'বিপরীত'-তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হয়; এই দ্বৈতজ্ঞান যেমন অনিবার্য্য—দুইয়ের কোনটাকেই বর্জ্জন করা যায় না, তেমনই অবিকারী, স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্পূর্ণ একটা কিছুর জন্য মানবাত্মার গভীরতর আকূতি নিবারণ করাও অসম্ভব। এক দিকে এই আত্যন্তিক প্রয়োজন, অপর দিকে সৃষ্টি ও সেই পরম তত্ত্ব এতই বিপরীত যে, ওই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বেদান্ত এই দুইয়ের নানা সম্বন্ধ নানা দিক দিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে যেমন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—অর্থাৎ, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের ঘোষণা আছে—তেমনই, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি নানা তত্ত্ববাদের দ্বারা সেই পরম তত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই অপর-তত্ত্বকে কোনরূপে কিঞ্চিৎ স্বীকার করার অস্বীকার-না-করার উপায়ও আছে—সে যেন স্বীকার-অস্বীকারের একরূপ লুকোচুরি। আমি এই সব সূক্ষ্ম তত্ত্ববাদের মধ্যে প্রবেশ করিব না, কেবল এই সকলের মধ্যগত একটা প্রশ্নকে অবলম্বন করিয়া আমার এই ব্যাখ্যার সৌকর্য্যবিধান করিব—তাহাতে পাঠকগণের ত্রস্ত হইবার কারণ নাই, বরং তাঁহাদের কৌতূহল জাগ্রত ও চরিতার্থ হইবে, এমন আশা করি! ধরা যাক—এই 'সৃষ্টি'র ঠিক বিপরীত যাহা তাহার নাম 'লয়'; এটুকু আমরা ধারণা করিতে পারি, যদি সৃষ্টিকে মিথ্যা বা অসৎ বলিয়া ধারণা করিতে হয়,

তাহা হইলে সহজ বুদ্ধির সহজ বিচারে লয়কেই সত্য বলিতে হয়—এই লয়ই তাহা হইলে সৎ-বস্তু ? আবার, সৃষ্টি যদি হয় একটা কিছুর নিরন্তর গতিক্রিয়া, তবে ওই লয়কে একটা চিরন্তন স্থিতির অবস্থা বলিতে হইবে ; ওই গতিক্রিয়াকেই যদি শক্তিরূপা বলিয়া ধারণা হয় এবং 'শক্তি' অর্থে ওই গতি—ওই নিরন্তরপ্রবাহী ক্ষণবুদ্‌বুদ্‌ময়ী সৃষ্টিধারা বুঝায়, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় গতিহীন, অর্থাৎ শক্তিবিক্ষোভহীন, ধ্রুব-শাশ্বত একটা কিছুকে 'লয়ে'র অবস্থা বলিতে হইবে। এই দুই তত্ত্ব এমনই পরস্পরবিরোধী যে এই দুইয়ের একটাকেই মানিতে হয়, দুইয়ের সমন্বয় করা বড়ই দুরূহ। বেদান্ত এমন একটা তত্ত্বের সন্ধান করিয়াছে, যাহা মূলে দ্বৈতাদ্বৈত, সদসৎ প্রভৃতি সর্ব্ববিশেষণ বর্জ্জিত। এই বস্তু ধ্যানগম্য—অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয় ; ইহা বুদ্ধি বা বাক্যের গোচর নয়। বুদ্ধ ইহাকে গঞ্জিকা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, তিনি মানবীয় সহজ বুদ্ধির বীর্য্যবলে কার্য্যকারণের শেষতম গ্রন্থি মোচন করিয়া সৃষ্টির অসারত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, এবং তাহার বিপরীত তত্ত্ব সেই লয়-তত্ত্বকে সহজ অর্থেই গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ সৎ বা কোনরূপ অস্তিত্বকেই স্বীকার করিলেন না—সৃষ্টি যেমন মিথ্যা, তেমনই সেই মিথ্যার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোন সত্তা নাই—যাহা আছে তাহা শূন্য। তাঁহার মতে লয় অর্থে শূন্যই বটে। তন্ত্র বেদান্তকেই অনুসরণ করিয়া ওই দুই বিপরীত তত্ত্বের মধ্যে একটা রফা করিল। বেদান্তমতে সকল দ্বৈতই মিথ্যা—সৃষ্টিও নাই, প্রলয়ও নাই ; অতএব লয়তত্ত্বও অ-তত্ত্ব ; তথাপি সৃষ্টিকে 'মায়া' বলিয়াও স্বীকার করিয়াছে—তন্ত্রের পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট। ইহার পর, যদি স্থিতিতত্ত্ব ও গতিতত্ত্বকে—লয় ও সৃষ্টিকে —একই শক্তির অবস্থাভেদ, অর্থাৎ 'স্বগতভেদ' (অতএব, সেই,

অদ্বৈতের অবিরোধী) বলিয়া উপলব্ধি করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টি আর মিথ্যা হয় না—তাহার মূল ধাতুটা যে 'সৎ' তাহা স্বীকার করিতে হয়। তথাপি তন্ত্রমতে, বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের মত, একটা নিষ্কল শিবের তত্ত্বও আছে, সকল গতি সেই পরম স্থিতিতে অবসানপ্রাপ্ত হয়। এই স্থিতি হইতেই গতির উৎপত্তি—এই শিবই শক্তিরূপে সৃষ্টিতে গতিমান বা অনন্ত রূপস্রোতে প্রবহমান। তন্ত্রমতে এই দুই সত্তা একই, এক হইতে অপরে এই যে উদ্ভাবন—ইহা সেই পরম তত্ত্বের বিকৃতি নয়; ইহাই তাহার স্বভাব।

তন্ত্রের এই তত্ত্ব সৃষ্টিকে, যে অর্থেই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বিশেষরূপে স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও স্থিতি ও গতি—শিব ও শক্তি—ব্রহ্ম ও জগৎ—এই দুইয়ের একটা পারমার্থিক ভেদ রহিয়া গিয়াছে। তথাপি তন্ত্র একটা খুব বড় সমস্যার কতকটা মীমাংসা করিয়াছে। কারণ এই সৃষ্টিকে উড়াইয়া দেওয়া—একেবারে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি বলিয়া অগ্রাহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়; ইহার সকল বাহ্য আবরণ নিঃশেষে মোচন করিলেও শেষ পর্য্যন্ত একটা এমন-কিছু থাকিয়া যায়, যাহাকে তত্ত্বরূপে স্বীকার না করিলেও একটা অনির্দ্দেশ্য, দুর্ব্বোধ্য কিছুরূপে স্বীকার করিতেই হয়, এবং সেই কিছুকে 'মায়া' নাম দিলেও সে নস্যাৎ হইয়া যায় না। তন্ত্র ইহাকে স্বীকার করিয়া—সেই মায়াকেও পরমতত্ত্বের অঙ্গীভূত করিয়াছে বটে, শক্তিকে শিব-শক্তিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি এই সৃষ্টিকে—আমাদের 'জগৎ ও জীবন'কে—একটা আপেক্ষিক সত্তা মাত্র দান করিয়াছে; কারণ, এই সৃষ্টিরও একটা লয়ক্রম আছে—শিব-শক্তিও নিষ্কল শিবে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টিক্রমে যাহা জগৎ, লয়ক্রমে তাহা আর থাকে না, থাকিলেও

বিকৃত-নামরূপের পরিবর্ত্তে স্বরূপ-নামরূপের অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় বিরাজ করে। অতএব সৃষ্টি হয় কালে—এবং কালেই 'লয়'-প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রমতে এই লয়যোগের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা—জীবদেহে কুণ্ডলিনীরূপা এই শক্তিকে—এই সৃষ্টি-বাসনাকে—ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া পরমশিবে লয় করিতে হয়। তাহা হইলে ইহাতে একটা ঊর্দ্ধ ও নিম্ন আছে—একটা হইতে আর একটাতে আরোহণ, একটার পরিণামে আর একটায় পৌঁছানো আছে—অর্থাৎ, সৃষ্টির যে মূল্য তাহাও আপেক্ষিক; জীবন ও জগৎ এই অর্থে সত্য যে, তাহার সেই গতি-ক্রিয়া শিব-শক্তিরই ক্রিয়া। শিব ও শক্তির যে ঐক্য-তত্ত্ব তাহাতেও একটা প্রবর্ত্তন ও নিবর্ত্তনের—উদয়-বিলয়ের ক্রমাবস্থা রহিয়াছে। অতএব, এই শিব-শক্তিবাদের দ্বারাও সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ বা নিরপেক্ষ 'সৎ' বলিয়া মানিয়া লওয়া গেল না।

একটা উপমার সাহায্যে ব্যাপারটা আর একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। 'সৎ' বা সেই পরম তত্ত্ব, সেই শিব—যেন একটি অক্ষয় অব্যয় অশ্বত্থবীজ; এই বীজের মধ্যে তাহার উদ্ভেদ-শক্তি সংহত বা সমাহিত আছে—তখন সেই বীজ ও তাহার শক্তিতে কোন ভেদ নাই। বরং সেই শক্তিরই যেন সমাহিত অবস্থার রূপ ওই বীজ; অতএব শক্তি অর্থে স্থিতি ও গতি দুই-ই। তথাপি ওই বীজের অবস্থা বা স্থিতির অবস্থাই মূল অবস্থা। ইহাই সেই নিষ্কল শিবের অবস্থা। শক্তি যখন হইতে গতির উন্মুখী হয়, তখনই সেই শিব একটু বিশেষিত হইয়া শিব-শক্তি অবস্থা পাইয়া থাকেন। সেই বীজই যেন অঙ্কুরিত বিকশিত হইয়া বিশাল শাখাপল্লবময় সৃষ্টিরূপ ধারণ করে; কিন্তু তখনও বীজ তেমনই থাকে, তাহা হইতেই শক্তির উদ্ভব ও ক্রমবিস্তার হয়। এই গাছটাই সেই গতির রূপ—সেই রূপ পূর্ণ পরিণতির পরে আবার ওই বীজে ফিরিয়া

যায়—শক্তি শিবে লীন হয়। উপমাটিতে হয়তো তত্ত্বের সূক্ষ্মতা ধরা পড়িল না ; ততখানি সূক্ষ্মতার প্রয়োজনও এখানে নাই ; কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শক্তির এই বিকাশের মুখে স্থিতি ও গতি পৃথক হইয়া রহিল—বীজ বৃক্ষে লয় পাইল না। বরং, যেন ওই বীজের উপরেই ভর করিয়া বৃক্ষ তাহার শাখা-প্রশাখা-বিকাশের গতিবেগ সঞ্চয় করিতেছে। আবার ওই গতি-শক্তি আপনাকে সংহরণ করিয়া—সৃষ্টিকে সংহার করিয়া—ওই স্থিতি-বীজে লয় পাইবে। ইহাকেই বলে সৃষ্টি-ক্রম ও লয়-ক্রম—দুইই একই শক্তির দ্বিবিধ গতি-লীলা। তথাপি, একটি অপরের সমধর্ম্মীও নয়, সমকালিকও নয় ; তাই এই গতির বিকাশরূপ যে সৃষ্টি তাহার মধ্যে যেমন স্থিতি নাই, তেমনই তাহা স্বপ্রতিষ্ঠও নয়। অতএব শিব-শক্তিবাদের দ্বারা সৃষ্টিকে যতখানি শোধন করিয়া লওয়া যাক না কেন—উহার সত্তা স্বয়ংসিদ্ধ নয় ; স্থিতির তুলনায় গতি কালাতীত নয়, বরং কালসাপেক্ষ ; ওই গতির মূলে যে স্থিতি—শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে পৌঁছিতে না পারিলে মহাকালের শাসন-মুক্ত হওয়া যায় না। এইজন্যই সেই দুইয়ের, সেই নিত্য ও অনিত্যের, স্থিতি ও ও গতির দ্বন্দ্ব ইহাতেও নিরস্ত হইল না ; সৃষ্টিকে—জগৎ ও জীবনকে—একটা নিরপেক্ষ সত্যের সামিল করা গেল না।

ভারতীয় দর্শন ও সাধন-তত্ত্ব ওই দুইয়ের দ্বন্দ্ব-নিরসনে যতগুলি পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তন্ত্রের পন্থাই প্রশস্ততম, সৃষ্টিকে ইহার অধিক মর্য্যাদা দেওয়া ইতিপূর্ব্বে আর সম্ভব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম একটা অতিশয় নূতন দিকে সেই পুরাতনকে ফিরাইলেন। তিনিই গতি ও স্থিতিকে, জগৎ ও ব্রহ্মকে—একই দেশে ও কালে অভেদরূপে বিদ্যমান দেখিলেন ; শিব ও শিবশক্তি, স্থিতি ও গতি, লয় ও

সৃষ্টি একই তত্ত্বের এ-পিঠ ও ও-পিঠ ; গতির সঙ্গে স্থিতি, স্থিতির সঙ্গেই গতি অভিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে ; একদিক হইতে দেখিলে যাহা ব্রহ্ম, অপর দিক হইতে দেখিলে তাহাই জগৎ। একটাকে পার হইয়া অপরটায় পৌঁছিতে হয় না ; কেবল, সেই দৃষ্টি লাভ করা চাই—সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিতে পারিলে, ছাদ, সিঁড়ি ও নিম্নতল সবই একই বস্তু বলিয়া নিমেষে অন্তরগোচর হইবে। জড়বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে static ও dynamic—দুই-ই এক শক্তির এককালীন স্ফূর্তি ; যে মুহূর্তে সৃষ্টি হইতেছে, লয়ও সেই মুহূর্তে হইতেছে ; স্থিতির উপরেই ভর করিয়া গতির ক্রিয়া চলিতেছে ; নিশ্চল শিবের বুকের উপরে আমরা যে নৃত্যোন্মত্তা শক্তিমূর্তি দেখিযা থাকি তাহার গূঢ় অর্থ এইরূপ কিছু একটা হইবে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ তত্ত্বত অভেদ —এই জগৎ-ব্রহ্ম-অভেদ তত্ত্বের প্রতীক—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনবিগ্রহ, তাঁহার সেই ইষ্টদেবতা 'কালী'।

শ্রীরামকৃষ্ণের নবমন্ত্র—পুরাতন সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের বাণী নয়

জগৎ-ব্রহ্ম-অভেদ তত্ত্বই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সাক্ষাৎ বাণীরূপ ধারণ করিয়াছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাণীরই অবতার। তত্ত্বটা নূতন নয় ; কিন্তু জীবন সম্পর্কে তাহার এমন অর্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই ; নূতন যে নয়, তাহার প্রমাণ, একজন তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত তন্ত্রের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

Its purpose is to give liberation to the Jiva (জীব) by a method according to which monistic truth is reached through the dualistic world, immersing its Sadhakas (সাধক) in the current of Divine Bliss by changing duality into unity, and then

evolving from the latter a dualistic play, thus proclaiming the wonderful glory of the spouse of Paramashiva (পরমশিব) in the love embrace of matter and spirit (জড ও চৈতন্য) ।

এই প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়িল—যতই অদ্ভুত বা অবিশ্বাস্য হউক, তাহাতে এমন কয়েকটি লক্ষণ আছে, যাহার জন্য সেই ঘটনাটিকে বড়ই অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে, একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সেবক ও প্রতিপালক মথুরবাবু আপনার কক্ষ হইতে বাহিরের অদূরস্থ ঠাকুরবাড়ির দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া ছিলেন ; সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ঘরের বারান্দায় পায়চারিরত শ্রীরামকৃষ্ণের উপর, এবং যাহা দেখিলেন. তাহাতে তাঁহার ভয় ও বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। পরমহংসদেব সেই বারান্দাটিতে পায়চারি করিবার সময় যখন এদিকে ফিরিতেছেন তখন তাঁহার মুখ কালীর মুখ, যখন আবার অপর দিকে ফিরিতেছেন তখন সেই মুখই মহাদেবের মুখ! এই যে দর্শন, ইহাকে 'psychic' একটা কিছু বলা যাইতে পারে ; কিন্তু সে যাহাই হউক, যদি ইহা স্বপ্নও হয়, তাহা হইলেও যে তত্ত্বটি উহাতে প্রতীকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, সে তত্ত্ব মথুরবাবুর মত একজন অজ্ঞানী ভক্ত স্বপ্নেও কল্পনা করিল কেমন করিয়া ? কিন্তু সে প্রশ্ন আমার নয়, আমি এই স্বপ্নের ঘটনাকেও বাস্তব ঘটনা অপেক্ষা সত্য মনে করি, এবং এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে, এক মথুরবাবু ছাড়া আর কোন শিষ্য বা ভক্ত ওই শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্বকে এমন চাক্ষুষ করে নাই! মথুরবাবু করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই ; মর্ম্ম কি আর কেহ বুঝিয়াছে ? আমার মনে হয়, এই তত্ত্বকেই বিবেকানন্দও, পৌরাণিক প্রতীকের ভাষায় নয়—তাঁহার গুরুর মধ্যে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি প্রকাশ্য কথায় ও বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার উপদেশ ও আদেশের মধ্যে ইহার কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণও আছে। একবার অর্দ্ধ-আবিষ্ট অবস্থায় তিনি জীবকে 'দয়া' নয়— 'শিব'জ্ঞানে পূজা করিতে হইবে—এই কথা একটি সত্য-মন্ত্রের মত ঘোষণা করিয়াছিলেন। সিঁড়ি দিয়া বাড়ির ছাদে উঠিয়া যে সত্যদর্শন হয়—রূপকের ছলে সেই তত্ত্বকথা তিনি প্রায়ই বলিতেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি; আবার, বিবেকানন্দকে তাঁহার সেই ভৎর্সনা—"তোর মন এত ছোট যে, তুই জগতের ভাবনা না ভাবিয়া নিজের মুক্তির জন্যই এমন অস্থির!"—তাহাও স্মরণীয়। এই সকল হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, পরমহংস-দেবের বাণী সেই পুরাতন সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের বাণী নয়—এ বাণী একেবারে নূতন না হইলেও, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ তত্ত্ব ইহাতে উকি দিতেছে। সে তত্ত্ব কি তাহা পূর্ব্বে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ওই যে একই মুখ শিব ও শক্তির মুখ, কেবল দিকপরিবর্ত্তন মাত্র; ওই যে জীব—কেবল তত্ত্বের দিক দিয়াই শিব নয়, তথ্যের দিক দিয়াও শিব; এ সকলের অর্থ অতিশয় স্পষ্ট—যে সত্য ব্রহ্মের সত্য, জগতের সত্যও তাহাই; সিঁড়ি ও ছাদ ভিন্ন বটে—সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিতে হয়, কিন্তু ছাদে উঠিলে ছাদ ও সিঁড়ি, উপরিতল ও নিম্নতল, ভিত্তি ও শিখর, সবই সমান ও সর্ব্বাঙ্গীণ একরূপ বলিয়া উপলব্ধি হয়। আমি উপরে এই তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি কেহ যেন তাহার দার্শনিক মূল্য যাচাই না করেন—দার্শনিক পরিভাষা বা দার্শনিক যুক্তিপ্রণালী—কোনটাই আমার অভ্যস্ত বা আয়ত্ত নহে; আমি নানা উপায়ে পরিচিত শব্দ ও উপমার সাহায্যে প্রাণপণে একটা তত্ত্বের আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র—আমি নিজে যে ভাবে বুঝিয়াছি

সেই ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; পাঠকগণকে কেবল সেই ইঙ্গিতমাত্র সহায় করিয়া নিজ নিজ বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বটির ব্যাখ্যা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। আধুনিক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ভাষায় যে তত্ত্বটিকে গতিতত্ত্ব ও স্থিতিতত্ত্বের সমন্বয় বলা যাইতে পারে তাহাই ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ—শিব ও শক্তির অদ্বৈত-তত্ত্ব। ওই স্থিতি ও গতিকেই লয় ও সৃষ্টি বলা যাইতে পারে; এবং লয় যদি নিরপেক্ষ এবং সৃষ্টি আপেক্ষিক হয়, তবে একটির গৌরব অপরের তুলনায় অধিক হয়, এবং দুইয়ের মধ্যে একটা অবস্থাগত প্রভেদ ও কালগত ব্যবধানও থাকে; লয়ের অবস্থা সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া থাকে, এজন্য সৃষ্টিকে পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, এই দুই সর্ব্বত্র অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান রহিয়াছে—সৃষ্টি-স্রোতের প্রতি তরঙ্গে, প্রতি মুহূর্ত্তে, ওই স্থিতি ও গতি সমভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে, তবে সৃষ্টিকে ব্রহ্ম হইতে একটা পৃথক কিছু মনে করিবার কারণ থাকে না। এই প্রসঙ্গে, আমাদের কালের এক চিন্তাশীল বাঙালী পণ্ডিতের এই মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি, তিনি লিখিয়াছেন—

Shakti bieng either static or dynamic, every dynamic form must have a static background. A purely dynamic activity (which is motion in its physical aspect) is impossible without a static support or ground (আধার)। Hence the philosophical doctrine of absolute motion or change, as taught by old Heraclitus and the Buddhists and by modern Bergson, is wrong. It is based neither upon correct logic, nor upon clear intuition. The constitution of an atom reveals the static-dynamic polarisation of

Shakti ; other and more complex forms of existence also do the same.

এক্ষণে আবার বিবেকানন্দের কথাই বলি। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার এই 'জগৎ-সত্য' মন্ত্রে দীক্ষালাভ হইয়াছিল যে, জীবই শিব :— উপনিষদের সেই 'আত্মা'ই মানুষরূপে এই জগতের সুখদুঃখের ভোক্তা হইয়া—শুধু সাক্ষী হইয়া নয়—তাহাকে তীর্থ-গৌরব দান করিয়াছে। মন্ত্র সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি ; শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে সেই মন্ত্রস্বরূপ হইয়া যেন একটি উপযুক্ত আধার খুঁজিতেছিলেন—নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। বালক যেমন তাহার ঈপ্সিত খেলনা দেখিয়া তাহা পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, তিনিও তেমনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের মধ্যে তিনি কি দেখিয়াছিলেন তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি,—এক দিকে মুক্ত শুদ্ধ আত্মার অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞান-ধাতু অপর দিকে ব্যক্তি-আত্মার বা মানুষ-সত্তার যাহা শ্রেষ্ঠ উপাদান—সেই পৌরুষ ; উভয়ের এমন মিলন ক্কচিৎ হইয়া থাকে। নরেন্দ্রের এই পৌরুষই তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল—তাহার সেই স্বাতন্ত্র্যাভিমান, উদ্ধত আত্মপ্রত্যয়, এবং ভক্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের প্রতি যেন একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা তাঁহাকে বড়ই আশান্বিত করিয়াছিল। তিনি জানিতেন, কোন্ শক্তি কোন্ তেজ তাঁহাকে এমন অশান্ত করিয়াছে, আত্মার সকল রহস্য অবগত ছিলেন বলিয়া তিনি এই পৌরুষের মধ্যেই প্রেমের সুপ্ত বীর্য্য দর্শন করিয়া পরম কৌতুক অনুভব করিতেন। নরেন্দ্রের দেহাবয়বেও তিনি তাহার অন্তর-পুরুষের পরিচয় পাইয়াছিলেন ; মুখমণ্ডলের নিম্নার্দ্ধে সেই প্রশস্ত গণ্ড, সুগঠিত চিবুক ও সুমিলিত ওষ্ঠাধর যেমন ইস্পাতস্বরূপ দৃঢ়তার—

অতি কঠিন সঙ্কল্পনিষ্ঠার পরিচায়ক, তেমনই, তাহার সেই পল্লবভারাকুল দীর্ঘায়ত দুই চক্ষু! সেই চক্ষু দুইটির গবাক্ষপথে তিনি নরেন্দ্রের আত্মার যে রশ্মিচ্ছটা দেখিতে পাইতেন, তাহাতে তাঁহার আর কোন্ সংশয় থাকিত না; তাই বড় স্নেহে তিনি তাহাকে 'কমলাক্ষ' বলিয়া ডাকিতেন। এই দুষ্ট বালকের দুষ্টামি তিনি যেমন পরম স্নেহে উপভোগ করিতেন, তেমনই কেমন করিয়া তাহাকে অতি সহজে বশ করিবেন তাহাও জানিতেন বলিয়া, তিনি সে বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যস্ততা বোধ করেন নাই। আরও কিছুদিন যাক, আরও কিছুদিন দুরন্তপনা করুক; কল ঘুরাইবার চাবিটি যে তাঁহার হাতেই আছে। এমন জ্ঞানের সহিত যখন এমন পৌরুষ রহিয়াছে, তখন ভাবনা কি? ওই অভিমান যে আত্মারই অভিমান, উহাতে যে এতটুকু ব্যক্তি-স্বার্থের বা ক্ষুদ্রতার কলঙ্কচিহ্ন নাই! অবোধ বালক, তোমার ওই অভিমান দিয়াই তোমাকে জব্দ করিতেছি। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নীতি'-জ্ঞান কম ছিল না—পরম-জ্ঞানীর অবস্থা বালকের মত অবস্থাই বটে, কিন্তু সে বালকোচিত অজ্ঞতার অবস্থা নয়। তাই শেষে একটিমাত্র কৌশলে তিনি নরেন্দ্রকে জয় করিয়া লইলেন। নরেন্দ্র কেবলই নির্ব্বিকল্প সমাধির—'সুখং আত্যন্তিকং' আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিত—স্পষ্টই বলিত যে, তাহাই পরম পুরুষার্থ। নরেন্দ্রের বিশ্বাস, পরমহংসদেবের মত ব্রহ্মপরায়ণ মহাপুরুষ তাহার এই কামনাকে প্রশ্রয় দিবেন—ইহাতে তিনি তাহার প্রতি আরও খুশি হইয়া উঠিবেন। কিন্তু একদিন সহসা সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তাহার ওই কথা শুনিয়া কঠিন ভৎর্সনা ও ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই বুঝি তোমার পৌরুষ, এই বুঝি তোমার আত্মগৌরব—এই বুঝি বীরত্ব! তুমি জগতের আর

সকলকে ফেলিয়া নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছ!" এই গ্লানিবোধ নরেন্দ্রের চিত্তে পূর্ব্ব হইতে যে ছিল, সাংসারিক সংকটে তাহার সেই দারুণ অন্তরসংগ্রামেই সে পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি; কিন্তু সংগ্রামশেষে নরেন্দ্র সংসার ত্যাগ করিতেই চাহিয়াছিল, তখনও তাহার জীবনে ওই স্পর্শমণির স্পর্শলাভ ঘটে নাই, তখনও সেই অপূর্ব্ব তত্ত্বকে সে 'দর্শন' করে নাই। আজ তাহার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল—যে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহারও মুখে এ কি কথা! মানুষের সেবাকে সেও মুক্তি-সন্ধানের তুল্যই, অথবা তাহারও অধিক মূল্যবান মনে করে! অথবা তাহার মতে, সে-ই যথার্থ মুক্তি ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে—যে জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করে না; এ বড় অপূর্ব্ব কথা! কিন্তু নরেন্দ্র সেই কথা, এবং কথার তত্ত্বকেও দূরে ঠেলিয়া, তাহার মস্তিষ্কে নয়—প্রাণের মধ্যে এক প্রবল প্লাবন অনুভব করিল, এবং এতদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আপনাকে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া দিল। ইহার পর, সেই মহাপুরুষের সম্বন্ধে কেবল একটা কথাই তাঁহার মুখে বার বার শোনা যাইত—'I felt his wonderful love' আমি তাঁহার আশ্চর্য্য ভালবাসা অনুভব করিয়াছিলাম। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আর কি দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আর কি দিয়াছিলেন—সে সকল কথা তিনি জগৎকে জানানো আবশ্যক মনে করেন নাই।

শৈব শক্তির মূলে বৈষ্ণবী শক্তির রস-সিঞ্চন

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মানব-প্রেম যে কত বড়—বিবেকানন্দ তাঁহার মধ্যে কোন্ প্রেমের রূপ দেখিয়াছিলেন, বিবেকানন্দকে পাইয়া তাঁহার এত

আনন্দ কেন, তাহার সম্পর্কে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। মঃ রোলাঁ তাঁহার 'বিবেকানন্দ-চরিত' নামক গ্রন্থে স্বামীজীর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন ; উক্তিটি এই—

The day when Naren comes in contact with suffering and misery the pride of his character will melt into a mood of infinite compassion. His strong faith in himself will be an instrument to re-establish in discouraged souls the confidence and faith they have lost. And the freedom of his conduct, based on mighty self-mastery, will shine brightly in the eyes of others, as a manifestation of the true liberty of the Ego.

শিষ্যের সম্বন্ধে গুরুর এই ভবিষ্যৎ-বাণী যে সত্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি, এবং ইহাতে বিবেকানন্দের অন্তরতম অন্তরের পরিচয় যে তিনি কিরূপ নিঃসংশয়রূপে অবগত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিটিতে কেবল তাহাই নয়, কেবল শিষ্যের নয়—গুরুরও যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, সে দিকটি কেহ অনুধাবন করেন নাই। পরমহংসদেবের ওই বাণীর মধ্যে তাঁহার নিজেরই প্রাণের আকৃতি ধরা পড়িয়াছে—এমন আর কোথায়ও পড়ে নাই ; ইহা সেই আকৃতি যাহার বশে এক মহাপ্রেম যুগে যুগে অতি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে যে দুঃখের উল্লেখ করিতেছেন তাহার ব্যাপ্তি ও পরিমাণ তিনি বুঝিলেন কেমন করিয়া? বিবেকানন্দের জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে যাহা সত্যই ঘটিয়াছিল, মঃ রোলাঁ তাহারও এইরূপ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি করিয়াছেন—

This meeting with suffering and human misery—not only vague and general—but definite misery, misery close at hand, the

misery of his people, the misery of India—was to be the flint upon the steel, whence a spark would fly to set the whole soul on fire. And with this as its foundation stone, pride, ambition and love, faith, science and action, all his powers and all his desires were thrown into the mission of human service and united into one single flame.

—ইহাই যদি শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং শিষ্যের সম্বন্ধে সেই আশাই করিতেন, তবে তাহারই বা অর্থ কি? তিনি তাঁহার সেই পল্লী-প্রান্তের ঘরখানিতে বসিয়া—গান, কীর্ত্তন, পুরাণ-প্রসঙ্গ, ভক্তিবিহ্বলতা ও ঘন ঘন সমাধি-অবস্থায় মগ্ন থাকিয়া—দুঃখের সে মূর্ত্তিকে দেখিলেন কি উপায়ে? তাঁহার প্রাণাধিক শিষ্যকে দুঃখের সে রূপ দেখাইবার জন্য তিনি এত অধীর কেন?—আর সকলকে তিনি ত্যাগ, ভক্তি ও আত্মশুদ্ধির উপদেশ দিতেন, তাঁহার অন্তরের এই মানবপ্রেম ও জগৎ-হিত-চিন্তার সম্যক পরিচয় তো আর কেহ পায় নাই! তাই, পারমার্থিক কল্যাণ বা ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনার সেই প্রাচীন ধর্ম্ম-মনোভাব লইয়াই আর সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত। কিন্তু নরেন্দ্রের উপরেই তাঁহার এই যে ভরসা, এবং তাহার বিবেকানন্দ-জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল—তাহা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে কোন্ প্রয়োজনে এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—জগতে যে মহামন্বন্তর আজ আরম্ভ হইয়াছে সেই মন্বন্তরের মুখেই তাঁহার সেই আবির্ভাব যে কত সময়োচিত হইয়াছিল—তাহা অনুমান করা দুরূহ হইবে না। তথাপি জগতের এই আসন্ন মহাদুঃখ-দিনের সংবাদ তাঁহাকে কে দিয়াছিল? সেই কালেই জগৎময় অধর্ম্ম ও অন্যায়ের যে বিষবাষ্প মানুষের সংসারে ছড়াইয়া পড়িতেছিল সে সংবাদই বা ওই বিদ্যাহীন সংসারজ্ঞানহীন গ্রামবাসী সরল-

ব্রাহ্মণ জানিলেন কোথা হইতে ? কবির ভাষায় আমাদেরও কি বলিতে ইচ্ছা হয় না—

> Oh closed about by narrowing nunnery walls
> What knowest thou of the world, and all its lights
> And shadows, all the wealth and all the woe ?

কিন্তু ইহাই তো পরমাশ্চর্য্য! এইজন্যই, বিবেকানন্দের সেই শৈব-শক্তির মূলে যে এক গভীরতর বৈষ্ণবীশক্তির প্রেরণা ছিল, একথা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'স্থিতি' রূপের মধ্যেই যে কি প্রচণ্ড 'গতি'-বেগ ছিল, এবং তাঁহাতে ওই দুইয়ের যে কি সমন্বয় হইয়াছিল, সে তত্ত্ব আজিও আমাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই। ভগিনী নিবেদিতাও যে তাঁহার গুরুর অন্তরালে এই মহাগুরুকে সর্ব্বদা দেখিতে পান নাই তাহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহার দুইটি উক্তি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

Sri Ramkrishna had been, as the Swami himself said once of him, "like a flower" living apart in the garden of a temple, simple, halfnaked. orthodox, the ideal of the old time in India suddenly burst into bloom, in a world that had thought to dismiss its very memory. It was at once the greatness and the tragedy of my own master's life that he was not of this type. His was the modern mind in all its completeness. In his consciousness, the ancient light of the mood in which man comes face to face with God might shine, but it shone on all those questions and all those puzzles which are present to the thinkers and workers of the modern world.

—এ কথা অস্বীকার করিবে কে? সহজ দৃষ্টিতে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে ইহাই তো সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তির বহির্ম্মুখ ওইরূপই বটে,

কিন্তু বিবেকানন্দের অন্তর্মুখ? ভগিনী নিবেদিতা বলিতেছেন, "**—the ancient light···might shine, but it shone···**", এই '**might shine**'—টাই শ্রীরামকৃষ্ণ নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং ওই '**but it shone**'—উহার জন্যই সেই মহাপুরুষ এই বালককে দেখিবামাত্র—শুধু বুকে নয়, মাথায় করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহার দ্বারাই তাঁহার প্রাণগত কামনা সিদ্ধ হইবে, সে যেন সকল সিদ্ধিলাভের অধিক; পূর্ব্বোদ্ধৃত ওই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে তাঁহার প্রাণের সেই আশ্বাস ব্যক্ত হইয়াছে। তাই যখন ভগিনী নিবেদিতার মুখেই আবার শুনি—

The sudden revelation of the misery and struggle of humanity as a whole, which has been the first result of the limelight irradiation of facts by the organisation of knowledge, had been made to him also as to the European mind. We know the verdict that Europe has passed on it all. Our art, our science, our poetry, for the past sixty years or more, are filled with the voices of our despair A world summed up into the growing satisfaction and vulgarity of privilege, and the growing sadness and pain of the dispossessed ; and a will of man too noble and high to condone the evil, yet too feeble to avert or arrest it ; this is the spectacle of which our greatest minds are aware. Reluctant, wringing her hands, it is true, yet seeing no other way, the culture of the West can but stand and cry, "To him that hath, shall be given, and from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Vae Victis ! Woe to the vanquished !" Is this also the verdict of the Eastern wisdom ? If so, what hope is there for humanity ? I find in my master's life an answer to this question,

—যখন বর্ত্তমান মানব-সংসারের দুঃখ-দুর্গতির চিত্র ওই অতি-গভীর

কথাগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে; এবং যে পুরুষ-বীরের ললাটে তিনি স্বহস্তে গৌরবের মুকুট চূড়া ও শুভাশিসের মাল্যচন্দন পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখেও যেমন মাথা আপনি নত হইয়া পড়ে, তেমনই, ইহাও ভাবিয়া বিস্মিত হই যে, বিবেকানন্দ যাহা সমক্ষে দেখিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা বহুপূর্ব্বেই অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একজন চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিবে না, এবং দেখিলেও হয়তো তাহাকে আর এক রূপে দেখিত—কারণ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টিতে জাগতিক ব্যাপারের মূল্যই অন্যরূপ; অপর পুরুষ যেন জ্ঞানের উপরে প্রেমের দৃষ্টিকে জয়ী করিয়া সাক্ষাৎ-দর্শন ব্যতিরেকেই তাহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এবং আর একজনের জ্ঞান-চক্ষুতে সেই প্রেমের অঞ্জন কবে কেমন করিয়া লাগিবে তাহা জানিতেন বলিয়াই, জ্ঞান ও পৌরুষের বজ্রবিদ্যুৎরূপী সেই মহাশক্তিমান শিষ্যকে এমন একটি শ্যামল সজল মেঘখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন যাহা অচিরে গগনব্যাপী হইয়া উঠিবে; এবং শেষে সেই অন্তর্গূঢ় বিদ্যুতের অসীম বেদনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া সেই মেঘ গলিয়া যাইবে—তাহারই অপর্য্যাপ্ত ধারাবর্ষণে তপ্ত ধরণী শীতল হইবে। ওই 'Eastern wisdom'-এর পূর্ণ ঘনীভূত বিগ্রহ যিনি—বিবেকানন্দ যাহার স্রোতোবেগোচ্ছ্বসিত নির্ঝর-রূপ, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রতীচ্য-সংস্কারবশে তাহার সেই স্থিরতাকে, গতির তুলনায় সমান প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিবেকানন্দের অন্তরতর যোগের কথা এই পর্য্যন্ত। অতঃপর আমি, বিবেকানন্দের চরিত-কথায় আরও কিছু দূর অগ্রসর হইব। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী হইতেই আমরা

জানিয়াছি, নরেন্দ্র কবে কেমন করিয়া বিবেকানন্দরূপে দ্বিজত্ব লাভ করিবেন—তাঁহার জীবনের ব্রত নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে মঃ রোলাঁর একটি উক্তি যেমন যথার্থ, তেমনই সংক্ষিপ্ত-সুন্দর; আমি তাহারই সূত্র ধরিয়া কাহিনীর এই অংশ সমাপ্ত করিব। তাঁহার সেই উক্তিটি এই—

But this consciousness of his mission only came and took possession of him after years of direct experience, wherein he saw with his own eyes and touched with his own hands the miserable and glorious body of humanity—his mother India in all her tragic nakedness.

আমি এইবার ওই "miserable and glorious body of humanity" এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে নরেন্দ্রনাথের সেই নবজন্মের কথা বলিব।

চতুর্থ অধ্যায়

মানব-ধর্ম্ম ও বিবেকানন্দ

একটা কথা পুনরায় বলা আবশ্যক—আমি বিবেকানন্দের যে চরিতকথা বিবৃত করিতেছি তাহা বাংলার নবযুগের প্রধান প্রবৃত্তির সম্পর্কে; সে প্রবৃত্তি যে কি তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, কেবল এই প্রসঙ্গে, আমি যুগের অতীত যাহা তাহারও আলোচনা না করিয়া পারি নাই। এই লোকোত্তর চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে আমাকে একটু বেশি করিয়া সেই ধরণের আলোচনা করিতে হইয়াছে, আশা করি, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নহে। নবযুগের মানবধর্ম্ম—মানবপূজা, মানবত্বের মহিমাবোধ প্রভৃতি নূতন ভাবস্রোতের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং সেই স্রোতোধারার বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ—সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে তাহার নব নব অভিব্যক্তির ধারা ও ধরণ—বর্ত্তমান নিবন্ধের মুখ্য বিষয়। মানুষের মহিমার সেই রহস্য-সন্ধান একবার আরম্ভ করিলে তাহার কি শেষ আছে? যুগ, জাতি, দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়াও, দেশে ও কালে তাহার প্রকাশ সীমাহীন ও বিচিত্র; আবার যাহা নৈর্ব্যক্তিক তাহা ব্যক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায়, সেই ব্যক্তিত্বই নৈর্ব্যক্তিককে যেমন প্রত্যক্ষ তেমনই রহস্য-গভীর করিয়া তোলে। মানবতা বলিতে কোন তত্ত্ব বা ভাববস্তু নয়, কারণ, তত্ত্বমাত্রেই নিরাকার—জগৎ ও জীবনের সম্পর্কে তাহার কোন মূল্যই নাই। ব্যক্তি বা বিশেষকে বাদ দিয়া একটা নির্ব্বিশেষ কিছুর ধ্যান যখন আমরা করি, তখনই বস্তুকে হারাই; আমরা যাহাকে সার্ব্বজনীন বলি তাহা সৃষ্টির বহির্ভূত—আমাদেরই মনঃকল্পিত

একটা ধারণা মাত্র। আমি এই আলোচনায় তেমন কোন তত্ত্বকে বস্তুস্পর্শশূন্য করিয়া, ভাবকে রূপ-বিবর্জ্জিত করিয়া—তাহারই মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছি না ; এতটা জাতি ও একটা যুগের প্রতিনিধিরূপে এক এক ব্যক্তির সাধনায় সেই তত্ত্বের প্রকাশ যতটুকু প্রত্যক্ষগোচর করা যায়, আমি তাহারই পরিচয় দিবার চেস্টা করিতেছি। এজন্য বিবেকানন্দের মধ্যেও—কেবল একটা তত্ত্ব নয়, তাহার যে ব্যক্তি-স্বরূপ—সেই সুগভীর মানবতারই একটি বিশেষ রূপে, সকল তত্ত্বকেও যেন গৌণ করিয়া, এমন প্রবলতার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমি তাহাকেই প্রাধান্য দিতে চাই। বিবেকানন্দ নিজেও, তাঁহার সেই অতি উদ্ধত ও অতি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আদর্শকে নিজ আত্মার নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনে নিজের জন্যই গোপন রাখিয়া, তাঁহার মানবীয় প্রেমকেই মর-জীবনে পূর্ণ মুক্তি দিয়াছেন ; তাঁহার সেই প্রেমই তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র প্রেরণা হইয়াছিল, এবং সেই প্রেম যে অর্থেই আধ্যাত্মিক হউক (সে আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি), তাহা যে নির্ব্বিশেষ নয়—বিশেষ, নিরাকার-ধর্ম্মী নয়—সাকার ধর্ম্মী, এবং সেইজন্যই তাহা জগৎ-সত্য ও জীবন-সত্যের সম্পূর্ণ অনুগত—ইহা লক্ষ্য করিলে, নবযুগের Humanism এই পুরুষ-অবতার মহাপ্রেমিকের জীবন-বাণীতে যে Gospel of Humanity-র রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

গুরুর দেহত্যাগের পর বরানগরের ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে যে একটি তরুণ ব্রহ্মচারীদল ধ্যান, তপস্যা ও কঠোর সন্ন্যাসের সাধন-চক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাহারই অভিভাবক হইয়া কিছুদিন স্থিরভাবে কাটাইয়াছিলেন ; শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই উপরে এই ভাইগুলির ভার অর্পণ করিয়া যান। কিন্তু নরেন্দ্র এইরূপ শান্ত আশ্রম-জীবন সহ্য করিতে

পারিতেছিলেন না, শীঘ্রই সর্ব্ব বন্ধন ত্যাগ করিবার—নামহারা গৃহহারা হইয়া মুক্ত আকাশ-তলে, গন্তব্যহীন পথে ভ্রমণ করিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল ; মাঝে মাঝে তিনি অল্পাধিক কালের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল, লোকালয় হইতে দূরে, একান্ত নির্জ্জনে, আত্মার নিঃসঙ্গতা—খাঁটি সন্ন্যাস-জীবনের পরমসুখ উপভোগ করা। তবু কে যেন ধরিয়া আনে—প্রাণ বেশিক্ষণ সেই নিষ্প্রাণতার সাধনা সহ্য করিতে পারে না। এই দুর্ব্বলতাকে যেন জয় করিবার জন্যই একদা, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই, শেষ মমতাবন্ধন সবলে ছিন্ন করিয়া তিনি একেবারে বাহির হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে আর একবার এইরূপ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সে আর এক কারণে ; তখন হিমালয়ের আলমোড়া প্রদেশে অবস্থানকালে এক দারুণ দুঃসংবাদ এতদূরেও পৌছিয়াছিল—তাঁহার শৈশব-সঙ্গিনী ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ ; এই ভগিনীকে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন, বিবাহের পর শ্বশ্রূগৃহে অতিশয় দুরবস্থায় তাহার জীবনান্ত হয়। এ সংবাদে বাণবিদ্ধ কেশরীর মত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি নিবিড়তর পর্ব্বত-গহনে প্রস্থান করিয়াছিলেন, কিছুদিন কোন সংবাদই ছিল না। এই একটিমাত্র ঘটনাতেই বিবেকানন্দের মনুষ্য-হৃদয়ের যে পরিচয় আছে—সন্ন্যাসীর পরিচয়ও তাহাতেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। প্রেম যত বড়, যত উদার ও ব্যাপক হউক, তাহার মূলে দেহের আত্মীয়তা যেমন, তেমনই একটা সাকার বিগ্রহ থাকিবেই ; বিবেকানন্দের মানব-প্রেমও দেশ ও জাতিকে লঙ্ঘন করিয়া একটা নির্ব্বিশেষ মহামানবের ধ্যানে চরিতার্থ হইতে পারে নাই ; স্পর্শ করিবার, স্পন্দন অনুভব করিবার মত একটা দেহ তাহার চাই। যে-প্রেম সমগ্র মানব-জগৎকে বুকে করিবার জন্য বাহুবিস্তার করিতে

পারে, সে প্রেম, অতি নিকট যাহা—তাহারই অধর, উরস বা চরণ-সরোজের পূজায় তুই চক্ষে আরতি-দীপ জ্বালাইবেই। যে মানুষকে ভালবাসে, সে স্বজনকে ভালবাসে নাই ; যে বিশ্বকে সত্যই আত্মীয় জ্ঞান করে, সে আপন সমাজকে, আপন দেশকে মায়ের মত, প্রণয়ীর মত ভালবাসে নাই, ইহা কখনও হইতে পারে না। বিবেকানন্দ দেশ-জাতি-নিরপেক্ষভাবে মানুষকে যে-চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি, কিন্তু সেই দৃষ্টির মূলে ছিল স্বজাতি-প্রেম , দেশকে এমন ভালবাসা বোধ হয় ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর কেহ বাসে নাই। এইবার সেই কথাই আসিতেছে।

নরেন্দ্রনাথের দ্বিজত্ব লাভ

উপরে বিবেকানন্দ-জীবনের যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অল্পকালের মধ্যেই—১৮৯০-৯১ সালে, তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর—হঠাৎ তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভুত প্রেরণা জাগিল। তখন তিনি হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিভূমির এক নির্জ্জন স্থানে সর্ব্ব-বিস্মৃতির ধ্যান-সুখ ভোগ করিতেছিলেন ; যেন তাহারই প্রতিক্রিয়া-বশে সহসা সেই বিজনতার পরিবর্ত্তে এমনই সজনতার পিপাসা জাগিল যে, তিনি সেই হিমালয় হইতে পদব্রজে কন্যাকুমারী তীর্থে পৌঁছিয়া তথাকার মন্দিরে পূজা নিবেদন করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত এই মহাদেশের ধূলি তিনি স্পর্শ করিবেন ; যত মানুষের যত সমাজ যত গৃহ আছে সর্ব্বত্র অতিথি হইবেন—সেই বিপুল জন-সাগরের কোন স্রোত কোন তরঙ্গ তাঁহার বক্ষের অপরিচিত থাকিবে না! তাহাই হইল ;

পূরা দুই বৎসর পরিব্রাজকরূপে তিনি সেই মহামাতৃভূমির শীর্ষ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত তাহার বিরাট দেহের সকল দৈন্য ও সকল ঐশ্বর্য্য চাক্ষুষ করিয়া, বেদনা ও বিস্ময়ে, ভক্তি ও করুণায়, এমন এক দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন, যাহা আর কোন সন্তান এ পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার জীবনের চরম দীক্ষা; এতদিনে তিনি দ্বিজত্ব লাভ করিলেন —ইহার পরেই তাঁহার বিবেকানন্দ-জীবনের আরম্ভ, তাঁহার চরিত-বিকাশের তথা চরিত-কথার শেষ এইখানে।

বিবেকানন্দের ভারত-দর্শন ও স্বদেশপ্রেম

বিবেকানন্দের জ্ঞান-চক্ষু পূর্ব্বেই উন্মীলিত হইয়াছিল, এইবার প্রাণ-চক্ষু উন্মীলিত হইল—সন্ন্যাসীকেও প্রেমে পড়িতে হইল। বিরাট ভারতবর্ষের খণ্ড-বিখণ্ড দেহে, নিজেরই প্রাণের সাহায্যে, তিনি এক অখণ্ড প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করিলেন। সেই মলিনবসনা, নিরাভরণার সর্ব্বদেহে তিনি "সর্ব্বার্থসাধিকা গৌরী নারায়ণী"র রূপ অসংশয় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিলেন। এই যে প্রত্যক্ষ করা ইহাই বিবেকানন্দের তপস্যার শেষ ফল। তিনি যে দৃষ্টি দ্বারা ভারতবর্ষকে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সেই তপস্যালব্ধ শক্তিকে পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল; সেই দৃষ্টিকে, ত্রিকালদর্শীর মত, অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত তিন কালের সাক্ষী করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানের যতকিছু দুর্দ্দশা তিনি স্থির দৃষ্টিতে ও দৃঢ়চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কিছুমাত্র নিরাশ হন নাই। তিনি সেই যুগসঞ্চিত ভস্মস্তূপের তলদেশে ভারতের চির-অনির্ব্বাণ আত্মাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ভাবে নয়, স্বপ্নে নয়, কল্পনায় নয়—

একেবারে বাস্তবের রূঢ়তম পরিচয়ের মধ্যে তিনি তাহার সেই মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই বাস্তব পরিচয়ের কিঞ্চিৎ আভাস না দিলে বিবেকানন্দের সেই দিব্যদৃষ্টিলাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে না, তাই আমি সেই বিষয়ে দুইটি গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু বিবৃতি ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিব। মঃ রোলাঁ এই ঘটনার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"The great Book of Life revealed to him what all the books in the libraries could not have done, which even Ramakrishna's ardent love had only been able to see dimly as in a dream···He was not only the humble litte brother who slept in stables or on the pallets of beggars, but he was on a footing of equality with every man, today a despised beggar sheltered by pariahs, tomorrow the guest of princes. Conversing on equal terms with Prime Ministers and Maharajas······ever teaching ever learning—gradually making himself the Conscience of India, its Unity and its Destiny."

"Everywhere he shared the privations and the insults of the oppressed classes. In Central India he lived with a family of outcast sweepers. Amid such lowly people who cower at the feet of society, he found spiritual treasures, while their misery choked him."

* * *

"He had traversed the vast land of India upon the soles of his feet······When he arrived at Cape Comorin, he was exhausted, but having no money to pay for a boat to take him to the end of his pilgrimage, he flung himself into the sea and swam across the shark-infested strait ;·· ···and when he had stepped on to the terrace of the tower he had just climbed at the very edge of the earth with the panorama of the world spread before his eyes,

the blood pounded in his ears like the sea at his feet; he almost fell……He had seen the path he had to follow. His mission was chosen."

ইহার পর ভগিনী নিবেদিতার উক্তি—

"When we read his speech before the Chicago Conference…… we find ourselves in presence of something gathered by his own labours, out of his own experience. The power behind all these utterances lay in those Indian wanderings of which the tale can probably never be complete. It was of the first-hand knowledge, then, and not of vague sentiment or wilful blindness, that his reverence for his own people and their land was born. It was a robust and cumulative induction, moreover, be it said, ever hungry for new facts and dauntless in the face of hostile criticism…… And more than this, it was the same thorough and first-hand knowledge that made the older and simpler elements in Hindu civilization loom so large in all his conceptions of his race and country."

বিবেকানন্দের মানবপ্রেম ও স্বজাতি বাৎসল্য

দেশকে এমন করিয়া দেখা বোধ হয় আর কেহ দেখে নাই; শুধু সেই দেহ হাত দিয়া স্পর্শ করাই নয়, ওই জ্ঞান ও ওই প্রেমের দৃষ্টি দ্বারা একেবারে একাত্ম হইয়া এ যেন তাহার অন্তরের অন্তরকে দেখিতে পাওয়া! এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বিবেকানন্দ নামক যে পুরুষ এবং তাঁহার যে বাণীকে আমি একটা বৃহত্তর কালধর্ম্মের অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার জন্ম হইয়াছিল তাঁহার মহাজীবনের এই মহালগ্নে; সেই পুরুষের যে জ্ঞানী-আত্মা এতদিন বিদেহী ছিল,

এইবার তাহা যেন মানবদেহ ধারণ করিল ; সেই মানবই একাধারে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-মানব ও ব্যূহ-মানব—Man ও Humanity। যাহা পরম সত্য বা Absolute—তাহা বর্ণহীন শূন্য—একটা নিরাকার ভাবময় সত্তা মাত্র ; সে সত্য সৃষ্টির বহির্ভূত, তাহা জগতের বা মানুষের ইতিহাসগত নয় ; সেই সত্যই যখন প্রেমের 'খাদ'-যুক্ত হয়, তখনই তাহাতে সৃষ্টির গঠন-কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, অরূপ রূপ পরিগ্রহ করে, নিরাকার ভগবান সাকার হইয়া উঠে। কিন্তু তখন ওই 'খাদ'কে অস্বীকার করিয়া, তাহার মলিনতার ত্রুটি নির্দ্দেশ যে করে, সে সৃষ্টিকেই অস্বীকার করে। সেই Universal, সেই নির্ব্বিশেষ যখন বিশেষের আলিঙ্গনে বদ্ধ হয় তখনই প্রেমের জন্ম হয়, এই নিয়ম ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রেমের পক্ষেই সমান। বিবেকানন্দ মানুষের আত্মাকেই সকলের উপরে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, সেই আত্মার কোন দেশ বা জাতিভেদ নাই ; তাহাই পরম সত্য ; কিন্তু সেই সত্যের তত্ত্বমাত্রকে যে উচ্চ চিন্তা বা উৎকৃষ্ট রস রূপে উপভোগ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সে মানুষের জীবনের মধ্যস্থলে কখনও আসিয়া দাঁড়ায় নাই,—ভগ্নজানু, দুর্গত মানুকে আপন স্কন্ধে তুলিয়া উদ্ধার করিবার বাস্তব সমস্যা-সঙ্কটে সে কখনও পড়ে নাই। বিবেকানন্দ মানব-প্রেমের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, নিজের বুকে সেই প্রেম অনুভব করিবার প্রয়োজন তাঁহার হইয়াছিল এবং নিজের জাতি ও দেশের দুরবস্থাই তাঁহাকে প্রেমের এমন অনুভূতিধনে ধনী করিয়াছিল। তিনি আগে, ভারতবর্ষনামক যে মানবগোষ্ঠী তাহাকে আপন হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলেন, এবং পরে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেই ভারতবর্ষকেই পূজা করিয়াছিলেন। সূর্য্যরশ্মি যেমন শূন্যে তাপ বিকিরণ করে না, উষ্ণতা উৎপাদনের জন্য তাহার একটি

অবয়বী পদার্থের আশ্রয় চাই, তেমনই প্রেমকে ক্রিয়াশীল হইতে হইলে তাহার একটা আধার চাই, সেই আধারকে ধরিয়াই সে আপনাকে নিরাধার করিতে পারে ; প্রেম যদি সত্যকার প্রেম হয়, তবে সেই আধারে বদ্ধ হইয়াই সে উচ্ছ্বসিত আবেগে সকল সীমা লঙ্ঘন করে। প্রেমের এই পরম রহস্য বিবেকানন্দের জীবনে যে-আকারে ও যে-মাত্রায় আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ও জগৎ-প্রেমের সেই অপরূপ সমন্বয়ের কথা—তাহার অন্তর্গত সেই গভীরতর সত্যের কথা, অতঃপর আমি পূর্ব্বোক্ত মনীষিদ্বয়ের উক্তির সাহায্যেই সুস্পষ্ট ও মনোজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিব, কারণ, তেমন করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমার নাই।

বিবেকানন্দের সর্ব্বজাতি-প্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্য এই দুই বিপরীত প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"পাশ্চাত্য দেশে তাঁহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকরূপেই দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাতে, নিখিল মানবের মধ্যে সেই একই আত্মার মহিমা-ঘোষণাই ছিল তাঁহার উপদেশের সারমর্ম্ম ; তাঁহার সেই কর্ম্মের অন্তরালে ভারতবর্ষের জন্য কোন ভাবনা বা তাহার হিতসাধনের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ পাইত না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি ; সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ ও জাতির দুর্দ্দশা-নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস, ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্ম্মান্তিক যাতনা-ভোগ।" ভগিনীর নিজের ভাষায়—

"It was the personality of my Master himself, in all the

fruitless torture and struggle of a lion caught in a net. For, from the day that he met me at the ship's side till that last serene moment when, at the hour of cow-dust, he passed out of the village of this world, leaving the body behind him, like a folded garment, I was always conscious of this element-in-woven with the other in his life."

'It was the personality of my Master."—বাক্যটি সত্যই অতি গভীর। অন্যত্র—

"He neither used the word 'nationality,' nor proclaimed an era of 'nation-making.' 'Man-making,' he said, was his own task. But he was born a lover, and the queen of his adoration was his Motherland……He was hard on her sins, unsparing of her want of worldly wisdom, but only because he felt these faults to be his own."

তিনি নিজে স্বামিজীর এই স্বজাতি-বাৎসল্যের সহিত তাঁহার মানব-প্রেমের সম্বন্ধ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"Like some great spiral of emotion, its lowest circles held fast in love of soil and love of nature ; its next embracing every possible association of race, experience, history, and thought ; and the whole converging and centring upon a single definite point, was thus the Swami's worship of his own land."

ভারতবর্ষকে ভালবাসার আরও কারণ ছিল—সে কারণ আরও স্পষ্ট। ভারতবর্ষই যে তাঁহার নিজের সেই জ্ঞান-চৈতন্যের জননী—তিনি যে তাহারই অমৃত-স্তন্যপানে আত্মার অনন্ত শক্তি ও অসীম আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন ; তিনি যে একান্তই সেই ভারতের সন্তান, এ চেতনা,

তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই। নিবেদিতাও তাহা বলিয়াছিলেন, যথা—

"Student and citizen of the world as others were proud to claim him it was yet always on the glory of his Indian birth that he took his stand. And in the midst of the surroundings and opportunities of princes, it was more and more the monk who stood revealed."

সর্ব্বশেষে, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর সহিত বুদ্ধের তুলনা করিয়া বলিতেছেন—"খ্রীষ্ট-পূর্ব্বকালে বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র দুই বিভিন্ন মুখে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ; এক দিকে তাঁহার সেই ধর্ম্মের উৎস-মূল হইতে একটি প্রবল স্রোতোধারা বহির্গত হইয়া দেশ-দেশান্তর প্লাবিত করিয়াছিল ; সেই বাণী-প্রচারের ফলে প্রাচ্য-মহাদেশে কত জাতির নব জন্ম হইয়াছিল— কত নব নব সমাজ, নূতন সাহিত্য, নূতন শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছিল ; কিন্তু আর এক দিকে, ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে তাহার কাজ হইয়াছিল অন্যরূপ—

"The life of the Great Teacher was the first nationaliser. By democratising the Aryan culture of the Upanishads, Buddha determined the common Indian civilization, and gave birth to the Indian nation of future ages."

—সেইরূপ বিবেকানন্দের মহাজীবনেও একই কালে দুইটি পৃথক্ অভিপ্রায়-সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—"One of world-moving, and another, of nation-making"। আমার মনে হয়, এই ঐতিহাসিক তুলনাটি বড় যথার্থ হইয়াছে, একটা অতীত ঘটনার সাক্ষ্য বর্ত্তমানের ঘটনাটিকে সহজবোধ্য করিয়াছে। মঃ রোলাঁ একটি মাত্র

কথায় বিবেকানন্দের এই স্বদেশপ্রেমের একটি বড় সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা—"His universal soul was rooted in its human soil"। আমি নিজে এ সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি, এ যেন তাহাঁরই ঘনীভূত নির্য্যাস। ওই "human soil" কথাটিই এ সম্বন্ধে আমারও আদি ও শেষ কথা।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবেকানন্দের মানব-প্রীতির বিশেষত্ব

"All great doctrine, as it recurs periodically in the course of the centuries, is coloured by reflections of the age wherein it appears; and it further receives the imprint of the individual soul through which it runs. Thus it emerges anew to work upon men of the age. Every idea as a pure idea remains in an elementary stage, like electricity dispersed in the atmosphere, unless it find the mighty condenser of personality"—M. Romain Rolland : *The Life of Vivekananda.*

বিবেকানন্দের চরিত-কথা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহার পর তাঁহার বাণীর কিছু পরিচয় দিলেই আমার প্রয়োজন সমাধা হইবে। সে বাণীর বিশেষত্ব এই যে, তাহা কেবল ভাবুকতা, চিন্তাশক্তি, অথবা, যাহাকে উৎকৃষ্ট প্রতিভা বা মনীষা বলে—তাহারই জীবন-বিচ্ছিন্ন, বস্তুসম্পর্কহীন তত্ত্ব বা সত্য-প্রতিষ্ঠার বাণী নয়; তাহাতে বাস্তব জীবনের গূঢ়তম ও বৃহত্তম সমস্যার সম্মুখীন সদ্য পরিত্রাণ-প্রয়াসী এক অতিশয় শক্তিমান পুরুষের দুর্দ্দমনীয় উদ্যম স্ফুরিত হইয়াছে; বিবেকানন্দের জীবনও সেই বাণীকে সপ্রমাণ করিয়াছে। সেই সমস্যা মূলে এক হইলেও তাহার শাখা-প্রশাখা আছে, এই বাণীতেও তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। আমি বিশেষ করিয়া তাহার একটা দিকই লইব—যে দিকটির সহিত বর্ত্তমান আলোচনার সাক্ষাৎ যোগ আছে, যে দিকটি তাঁহার বাণীর খুব প্রয়োজনীয় ও সার্থক দিক বলিয়া মনে হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে, শাস্ত্র ও দর্শনঘটিত নানা তত্ত্বের মৌলিক

ব্যাখ্যাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে—সে সকলও তাঁহার বাণীর অন্তর্গত, চিন্তার দিক দিয়া তাহাদের মূল্য কম নয়। কিন্তু মানব-ইতিহাসের এই মহাযুগান্তরকালে, তিনি নব জীবন-যজ্ঞের উদ্গাতারূপে যে প্রাণদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রকৃত 'বাণী'; আমি সেই বাণীরই যথাসাধ্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

আমার মনে হয়, এই ভারতবর্ষেই—এই অতি-দুর্গত, মোহগ্রস্ত, ভয়ার্ত্ত ও বহু-শৃঙ্খলিত মানবাত্মার দেশেই—সর্ব্বমানবের মুক্তিসংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে; এই দেশেই তাহার ক্রুশবিদ্ধ দেহের অবতারণ ও পুনরুত্থানের মন্ত্রোচ্চারণ হইতেছে; এই মহাশ্মশানই যে মানুষের সেই নবজন্মের সূতিকাগাররূপে ক্রন্দন-শেষে হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হইবে, তাহা অসম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে পুরুষোত্তমের দর্শন এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষই অল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া ভূমার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল—তমসার পারে হিরণ্যবর্ণ মহান্ পুরুষের চকিত দর্শন লাভ করিয়া, "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—তাহারই লোভে আর সকল লাভকে তুচ্ছ করিয়াছিল; এবং অন্তরের অন্তরে সেই এক ভিন্ন আর কিছুকেই মূল্য দেয় নাই বলিয়া, পরমার্থ হইতে অর্থকে নিরতিশয় তিরস্কৃত করিয়া, অবশেষে এমন অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে যে, তেমন অবস্থা আর কোন দেশে—তাহার সমতুল্য কোন মানবসমাজে—হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসেই, সেই ঊর্দ্ধতম সোপান হইতে নিম্নতম সোপান পর্য্যন্ত মানুষের উত্থান-পতনের চক্ররেখা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ঐ গতি-চক্রের আবর্ত্তন অন্য জাতির জীবনে এখনও পূর্ণ হয় নাই; এখানে তাহা হইয়াছে বলিয়া, মানুষের উচ্চতম অধিকার এবং চরমতম অধোগতির উপলব্ধি এই জাতির জীবনেই ঘটিয়াছে। এ জাতির

জীবনের সেই দুই প্রান্তকে—বর্ত্তমানকে প্রত্যক্ষ, এবং অতীতকে জাতিস্মরের মত অপরোক্ষ করিয়া, বিবেকানন্দ মানুষের অদৃষ্টকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। ঐ পশুবৎ-নিগৃহীত ধূল্যবলুণ্ঠিত, আত্মচৈতন্যহীন মনুষ্যমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখ—উহারা কি মানুষ? উহারা কি সেই দেশ ও সেই জাতির বংশধর যাহারা অমৃতের জন্য পাগল হইয়াছিল, যাহারা সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর সর্ব্বমানবকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল? ইহারাই কি সে মহাতীর্থের অধিবাসী—ইহাদেরই আদিকালাগত বংশধারা কি সেই গঙ্গোত্তরী ধারায় অভিষিক্ত হইয়াছে?—যাহার উদ্দেশে আধুনিক কালের এক অমৃতপিপাসু য়ুরোপীয় মনীষী আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠেন—

Man must rest, get his breath, refresh himself at the great living wells, which keep the freshness of the eternal. Where are they to be found, if not in the cradle of our race on the sacred heights, whence flow on the one side the Indus and the Ganges, on the other, the torrents of Persia, the rivers of Paradise?—(**Michelet :** *The Bible of Humanity*. রোমাঁ রোলাঁ কর্ত্তৃক তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-গ্রন্থের মুখ-পত্রে উদ্ধৃত।)

সেই জাতির সেই দেহের দিকে বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন—কোন্ দৃষ্টিতে, তাহা বলিয়াছি। এক দিকে যেমন গভীর মমতায়, অপরিসীম অনুকম্পায় তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনই, যেন তাঁহার ললাটের তৃতীয় নয়নে, এই দুর্গতির নিম্নাভিমুখী ধারার যুগ-যুগান্তর উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সেই স্থির অপলক দৃষ্টি যতই গভীর হইয়া উঠিল, ততই যেন সেই দুই প্রান্তের ব্যবধান—সেই দেবত্ব ও পশুত্বের বৈসাদৃশ্য—লোপ পাইতে লাগিল। সোনায় কখন কলঙ্ক ধরে

না, আত্মার কখন অধোগতি হয় না ; কালের ধারায় কেবল রূপ-বিবর্ত্তন হয়, তাহা বিবর্ত্তন মাত্র—পরিণাম নয়। এই বিবর্ত্তনকেই স্বীকার করিতে হইবে পরিমাণকে নয়—তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, ঐ দেহ মৃত বা পতিত নয়—ঐ মোহ সাময়িক মূর্চ্ছা মাত্র ; বরং ঐ দেহেই আত্মার পুনর্জ্জাগরণ সুসাধ্য। ইতিহাসও মিথ্যা নয়—এক অর্থে তাহা সত্য ; তাহা সেই এক অবতারী আত্মার জাতি-যুগ-দেশ-ব্যাপী লীলাভিনয়-কাহিনী, তাহাতে আত্মার বন্ধন নয়—তাহার স্বেচ্ছা-বিহারের অসীম সামর্থ্যই সূচিত হয়। এই দৃষ্টির মূলে ছিল সেই ভারতীয় আত্মদর্শন ; তাই আত্মার এই ঘোরতর লাঞ্ছনাও আত্মার সেই মহিমাকেই এক উজ্জ্বল দীপ্তিতে অধিকতর দীপ্যমান করিয়া তুলিল। মনুষ্যত্বের ঊর্দ্ধ হইতে অধস্তল এমন এক পলকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার—সেই দুই সীমাকে এমন যুক্ত করিয়া লইবার অবকাশ ভারতবর্ষের মনুষ্য-সমাজেই সম্ভব হইয়াছিল।

বিবেকানন্দের মানবতাবাদ

বিবেকানন্দের এই যে 'মানুষ' বা 'মানবাত্মা'—ইহার স্বরূপ একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া না লইলে, তাঁহার বাণীর মর্ম্ম, তথা মহামানব-বাদ, পরবর্ত্তীকালের নানা ভাব-চিন্তা ও মতবাদের মধ্যে হারাইয়া যাইবে। এক দিকে তিনি যেমন ঘোরতর অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক—'আত্মা' বলিতে এক অখণ্ড নির্ব্বিশেষ বিশ্বাত্মায় বিশ্বাসী, তেমনই, 'মানুষ' বলিতে সেই 'আত্মা'র বহু-বিচিত্র বিশেষ রূপকেও তিনি মানিয়া লইয়াছেন। মানব-জাতি সেই এক 'পুরুষে'র সৃষ্টিযজ্ঞে উৎসর্গীকৃত অবয়বী রূপ ; এই বিরাট অবয়ব যেমন একই আত্মার নিশ্বাস-বায়ুতে পূর্ণ, তেমনই ঐ সৃষ্টিও

বৈচিত্র্যের রস-রূপে সীমাহীন। এই বহুত্ব—এই Particularity—না মানিলে সৃষ্টিও অবাস্তব হইয়া যায়। বিবেকানন্দ এই 'এক' ও 'বহু'কে সমদৃষ্টিতে দেখিবার মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার গুরুর নিকটে—শ্রীরামকৃষ্ণের 'কালী'কে তিনি যে শেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। ঐ 'একে'র দৃষ্টি যেমন জ্ঞানের দৃষ্টি, তেমনই ঐ 'বহু'র দৃষ্টিই প্রেমের দৃষ্টি ; প্রেম যখন ঐ জ্ঞানেরদ্বারা পরিশুদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, তখনই এক-'মানুষ' ও সর্ব্বমানব,—এক জাতি ও সর্ব্বজাতি, সেই প্রেমে অভিন্ন হইয়া উঠে। এই Universal বা নির্ব্বিশেষে-'একে'র তত্ত্বে উঠিবার একমাত্র সোপান কিন্তু ঐ Particular ; যে-দৃষ্টিতে এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আর থাকে না— সেই দৃষ্টি বুদ্ধিজীবী তার্কিকের নাই ; সেই অপরোক্ষ-জ্ঞান একরূপ অধ্যাত্মশক্তি-সাপেক্ষ। সাধক, কবি ও প্রেমিকের মধ্যেই ন্যূনাধিক মাত্রায় সেই 'বোধির' পরিচয় পাওয়া যায় ; এজন্য আধুনিক কালের কাব্য-জিজ্ঞাসাতেও এই তত্ত্ব ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। "Whoever grasps this particular, grasps the universal also with it"—মহাকবি ও মহামনীষী গ্যেটের (Goethe) এই উক্তির ভাষ্যকার একজন আধুনিক কাব্য-সমালোচক বলিতেছেন, "He is not speaking of the same universals and particulars as the logician". কারণ, সেরূপ কবি-দৃষ্টিতে, "another faculty than conceptual thinking is at work. Goethe was perfectly clear about that. What he was really saying is that in the true poetic activity of the mind the logical distinction between particulars and universals is ignored, because it is invalid for that activity of mind। ইহার পর এই সমালোচক যে কথাটি বলিয়াছেন তাহার মত গভীর ও মূল্যবান কথা আর নাই—"In

poetry, *qua*-poetry, there are neither particulars nor universals, abstracts or concretes." ইহা শুধুই কাব্যের তত্ত্ব নয়—জগৎ-ব্রহ্মের এই অভেদ-তত্ত্বই পরমতত্ত্ব বলিয়া, এতকাল পরে ভারতবর্ষের সেই পুরাতন বাণীই এক নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—জ্ঞান ও প্রেম, কাব্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, অস্তি-ভাতি ও নাম রূপ—এক অখণ্ড সত্যের অধীন হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও একটু গোল থাকিবার আশঙ্কা আছে, কারণ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'বিশ্বমানব'-বাদ নামে এক অভিনব তত্ত্ব সুলভ কুলচুর বিলাস ও অজ্ঞতামূলক প্রাজ্ঞতার পক্ষে বড়ই উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। 'বিশ্বমানব' নামটার কোন দোষ নাই—বরং আমরা যে 'মানব'-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি, ঐ নাম তাহার খুবই উপযোগী; কিন্তু যে অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাতে 'ভাবের ঘরে চুরি' আছে। একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী দার্শনিক পণ্ডিত বোধ হয় উহারই অনুবাদ করিয়াছেন—'Cosmic Man', যদিও তাহার অর্থ ঠিক রাখিয়াছেন। বিবেকানন্দের Humanity যে অর্থে Universal, সে অর্থে Particular-ই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ও পরিচয়; তাহাতে বৈচিত্র্যও যত বেশি, সেই একের মহিমাও তত প্রকট; 'অনেকে'র মধ্যেই সেই 'একে'র গভীরতর উপলব্ধি সম্ভব—বিশেষই নির্বিবশেষের নামাঙ্কিত পাদপীঠ। কিন্তু ঐ 'বিশ্বমানব'—সর্ব্বমানবের একটা পিণ্ডীভূত সত্তা, একটা বর্ণহীন রূপহীন ভাবনির্য্যাস মাত্র। বিবেকানন্দের ধ্যান-ধৃত যে বিশ্বমানব—তাহা ইতিহাসের ধারায়, দেশ-কাল-পাত্রের নানা রূপে ও নানা অবস্থায় নিত্য-নব-প্রকাশশীল; তাই অতি প্রাচীন হইতে অতি-আধুনিক পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই বিচিত্র ও বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

তিনি Universal-এর চক্ষে Particular-কে দেখিতেন না, Particular-এর মধ্যেই Universal-কে দেখিতেন। এই দেখার দুই একটি সহজ দৃষ্টান্ত দিব। ইটালি-ভ্রমণকালে রোমের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসকল তাঁহাকে যেমন অভিভূত করিয়াছিল, তেমনই খ্রীষ্টীয় উপাসনা-মন্দিরের অভ্যন্তর-দৃশ্য ও উপসনার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ কিছুমাত্র বিজাতীয় বলিয়া মনে হয় নাই—"He was profoundly touched by the memories of the first Christians and martyrs in the Catacombs, and shared the tender veneration of the Italian people for the figures of the infant Christ and the Virgin Mother"; তেমনই, একবার ইংলণ্ড-যাত্রাকালে তাঁহার জাহাজ যখন জিব্রাল্টার প্রণালীতে প্রবেশ করিল, তখন ঐখানে আফ্রিকা হইতে আরব-মূরগণের স্পেন-আক্রমণের সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, তিনি সেই মূরগণের সহিত 'দীন্ দীন্'-শব্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি উক্তি বড়ই যথার্থ, তিনি লিখিয়াছেন—

"That which emerges most clearly is his 'universal sense'—he had hopes of democratic America, he was enthusiastic over the Italy of art, culture, and liberty. He spoke of China as the treasury of the world. He fraternised with the martyred Babists of Persia. He embraced in equal love the India of the Hindus, the Mahomedans and Buddhists. He was fired by the Moghul Empire."

তাঁহার জীবনচরিতকার (*Life of the Swami Vivekananda*, by His Disciples) লিখিয়াছেন—

"In Egypt he was specially interested in the Cairo Museum, and his mind often reverted, in all the vividness of his historic imagination, to the reigns of those Pharaohs who made Egypt mighty and a world-power in the days of old···And here in Egypt it seemed as if he were turning the last pages in the Book of Experience."

এই সকল হইতে বিবেকানন্দের "Universal Sense" যে কি অর্থে Universal তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই যে 'Book of Experience', ইহা কিসের 'experiene'—কোন্ মানুষের পরিচয়-কাহিনী? 'বিশ্বমানব' যদি একটা ভাবগত বস্তু হয়—বাস্তব মানব-সত্তা হইতে কতকগুলি সাধারণ মানবীয় গুণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সেইগুলির সমবায়ে গঠিত একটা নির্ব্বিশেষ আইডিয়াল বা মানস-বিগ্রহকে 'বিশ্বমানব' নাম দিয়া, যদি তাহারই পূজা করা হয়, তবে তাহা এই Universal মানুষ নয়,—যে মানুষ এক হইয়াও বহু, যে মানুষ সর্ব্বত্র Concrete বা রূপময়। এজন্য ঐ 'বিশ্বমানব' নামটির অর্থ-বিভ্রাট নিবারণের জন্য আমি উহার নাম দিব 'মহামানব', এবং ইহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিবার জন্য, ইহার একটা সাহিত্যিক ব্যাখ্যাও দিব।

মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রের কবি-দৃষ্টিতে (কবিরও এই দৃষ্টির কথা আগে বলিয়াছি) এই Humanity বা মহামানবই কত অপরূপ রূপে ধরা দিয়াছিল! তাঁহার সৃষ্ট সেই ব্যষ্টি-মানবের অগণিত অনন্য-সদৃশ চরিত্র-রাজিতে সেই এক মানুষই সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ইংরেজ কাব্যসমালোচক সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—

It was Shakespeare's prerogative to have the universal which is potential in each particular, opened out to him, the *homo gene-*

ralis, not as an abstraction from observation of a variety of men, but as the substance capable of endless modifications.

এই *homo generalis*-ই সেই মহামানব—যাহা পিণ্ডীভূত সমষ্টির abstraction বা ভাবনির্য্যাস নয়, বরং এমন একটা বস্তু যাহার ব্যষ্টি-রূপের অন্ত নাই। তথাপি শেক্‌স্‌পীয়র particular-এর মধ্য দিয়াই সেই universal-এর উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কারণ, উহাই খাঁটি কবি কল্পনার জ্ঞানযোগ ; এবং "whoever has a living grasp of this particular grasp the universal with it, knowing it either not at all, or long afterwards"। আমাদের রবীন্দ্র-নাথেরও কবিজীবনের পূর্ণযৌবনে—particular হইতে universal নয়, universal হইতে particular-এ তাঁহার কল্পনার আসক্তি লক্ষ্য করা যায় ; তাঁহার সুবিখ্যাত 'বসুন্ধরা' কবিতাটি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। সেখানে কবি তাঁহার ব্যষ্টি-জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই যাহা সর্ববৈচিত্র্যের মূল উৎস—বিরাট প্রাণধারার 'বসুন্ধরা'য় নিমজ্জিত হইয়া বহুত্বের—particular-এর রস আস্বাদন করিতে অধীর হইয়াছেন—

ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত।···
···শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে।

তার পর—

ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে। উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন। তিব্বতের গিরি তটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম্ম-অনুরত; সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।

—তথাপি এই ইচ্ছাও সেই দৃষ্টি সম্ভূত নয়, যাহাতে—"there are neither particulars or universals, abstracts or concretes" ইহাতে universal-এর চেতনাই প্রবল ও মুখ্য—ইহা সেই শেক্‌স্‌পীরীয় দৃষ্টি নয়। কিন্তু এই সঙ্গে শেলীর কাব্যমন্ত্রের তুলনা করিলে আমাদের ঐ জগৎ-ব্রহ্ম অভেদের তত্ত্ব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। শেলীর কল্পনা খাঁটি বৈদান্তিক—সর্ব্বপ্রকার Concrete ও Particular-এর বিরোধী। শেলীর আদর্শ-'মানুষ' সর্ব্ববন্ধন ও সর্ব্ব-উপাধিমুক্ত 'মানবাত্মা'—

> **The loathsome mask has fallen, the man remains**
> **Sceptreless, free uncircumscribed, but man**
> **Equal, unclassed, tribeless, and nationless,**
> **Exempt from awe, worship, degree, the king**
> **Over himself : just, gentle, wise : but man**
> **Passionless ;**

—এই গুণগুলি সব একত্র অবস্থান করার উপায় না থাকিলেও পড়িতে পড়িতে মনে হয়, মানবাত্মার আদর্শ-হিসাবে ইহা চূড়ান্ত বটে; ইহাকে বিবেকানন্দের আদর্শও বলা যায়, আবার আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীর আদর্শও প্রায় এইরূপ বটে; কিন্তু সৃষ্টি-সত্যের সহিত কোনরূপ বোঝাপড়া ইহাতে নাই—যাহা বিবেকানন্দের বাণীতে আছে; তাহার জন্য শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কোন মাথাব্যথাই নাই, কারণ শেলীর যাহা আদর্শ তাহাই তাহাদের বাস্তব; তাহাদের চিন্তাভিত্তিও শেলীর সম্পূর্ণ বিপরীত। শেলীর ঐ আদর্শ বাস্তব-নিরপেক্ষ হইলেও, শেলী বাস্তবের বাধাকে অস্বীকার করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্ষেপের অন্ত নাই। মানুষের দেহটাই তাহার আত্মার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির একটা বড় বাধা 'Chance and death and mutability'-র নিয়তি-নিগড় যদি না থাকিত তাহা হইলে ঐ আত্মা—

Might oversoar
The loftiest star of unascended heaven,
Pinnacled dim in the intense inane.

—এমন একটা ভাবনার প্রশ্রয় দিতে আধুনিক মহা-বস্তুবাদীরা শিহরিয়া উঠিবে, যদিও, আত্মহীন বস্তু যে-মানুষ, তাহার অধিকার-ঘোষণায় শেলীর কবিতার ঐ বিশেষণগুলিকে অগ্রাহ্য করিবে না।

সাহিত্যিক ব্যাখ্যা এই পর্য্যন্ত, এখন সেই 'বিশ্বমানব' ও এই 'মহামানব'-বাদের পার্থক্য-বিচার শেষ করিব। একটিতে দেহদশাধীন মানুষকে বাস্তব নিয়তি-নিয়মের বন্ধনে, বিশিষ্ট গুণে ও রূপে, নানা অবস্থায় দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে; অপরটিতে দেশকাল প্রভৃতির ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহার একটা ভাব-রূপের ধ্যান মাত্র আছে; এজন্য এই

অপরটিতে—বিশ্বমানবের ঐ মানস-বিগ্রহ-পূজায়—মানুষহিসাবেই মানুষকে যে শ্রদ্ধা, তাহার প্রতি প্রেমের যে বাস্তব-অনুভূতি—সেই বিশেষের প্রীতি নাই। বিবেকানন্দের বাণী যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি ; তিনি সকল জাতির সকল মানুষকেই একটা abstract, তথা universal মানবতার আইডিয়াল দ্বারা বিচার করিতেন না ; প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই মানবতার বিশিষ্ট বিকাশকে বুঝিতে চাহিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। উপরে মূরগণকর্ত্তৃক স্পেন-বিজয়ের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়া বিবেকানন্দের যে ভাবোল্লাস হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি—তাহার কারণ ইহাই। তিনি মূরগণের সেই ধর্ম্মোন্মাদ-প্রজ্জ্বলিত-বীরত্ব-বহ্নিকে তাহাদের জাতিসুলভ একটা গুণের পরকাষ্ঠা বলিয়া, তাহাতেও মানবতার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। একবার পরিব্রাজক-বেশে কাশ্মীর ভ্রমণকালে পিপাসার্ত্ত হইয়া তিনি এক কৃষক-রমণীর কুটীরে জল চাহিয়াছিলেন ; পিপাসা-নিবৃত্তির পর তিনি গৃহস্বামিনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'মাঈ, তোমার ধর্ম্ম কি ?' তাহাতে সে এমন কণ্ঠে উত্তর করিল—'খোদাকে ধন্যবাদ—আমি মুসলমানী' যে, বিবেকানন্দ তাহাতে মুগ্ধ হইলেন ; তাহার কণ্ঠে ও মুখে-চক্ষে একটি শান্ত গভীর সাত্ত্বিক আবেগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, সেই সরল ভক্তির অন্তরালে একটি খাঁটি ভারতীয় মনোভাব রহিয়াছে ; সম্প্রদায় যাহাই হউক—রক্তের ভারতীয় সংস্কৃতি মুছিবার নয়। এখানেও সেই একই কারণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিবেকানন্দের Humanism বা মানবপ্রীতিও যে কিরূপ—তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। যেমন জাতি, যেমন সমাজই হউক—তিনি মানুষের অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। আমেরিকায় তাঁহার

গাত্রবর্ণদৃষ্টে অনেকে তাঁহাকে নিগ্রো বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সেজন্য পথেঘাটে তাঁহাকে অনেক অসুবিধাও সহ্য করিতে হইয়াছে। নিগ্রোগণও তাহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বহুসম্মানে তাহাদের সমাজে আহ্বান করিয়াছে এবং তাঁহার খ্যাতিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে—তিনি একদিনের জন্যও তাহাদের সেই ভুল ভাঙিয়া দেন নাই। কেহ কেহ এ বিষয়ে অনুযোগ করিলে তিনি সরোষে বলিয়াছিলেন, 'কি! আমি মানুষের মনুষ্যত্বের অপমান করিয়া নিজের মান বাড়াইব!' একবার কথাপ্রসঙ্গে, কোনও আদিম অসভ্য জাতির পাথর-পূজা সম্পর্কে একজন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহাতেও বিবেকানন্দ ব্যথিত হইয়া সেই জাতির পক্ষ সমর্থন করেন ; সেই জাতির অপরিণত জ্ঞানবুদ্ধির দিক দিয়া দেখিলে ঐরূপ আচরণ যে দূষ্য নয়, বরং উহাতে মানব-মনের শৈশব-সারল্যের এমন একটি কল্পনা ও বিশ্বাস-প্রবণতা প্রকাশ পাইতেছে যে, উহাও শ্রদ্ধার যোগ্য—এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা সত্যই বলিয়াছেন—

It was his love of Humanity, and his instinct on behalf of each in his own place, that gave to the Swami so clear an insight. There was the perpetual study of caste ; the constant examination and restatement of ideas ; and above all, the vindication of Humanity, never abandoned never weakened, always rising to new heights of defence of the undefended, of chivalry for the weak. Our Master has come and he has gone, and in the priceless memory he has left with us who knew him, there is no other thing so great, as this his love of man.

মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধা, এই প্রেম—ইহার মূলে, কেবল একটা বিশাল হৃদয় নয়, একটা বিরাট সত্যোপলব্ধি ছিল ; সেই সত্যও কোন শাস্ত্রবচন বা ভগবদ্বাণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় ; যে তত্ত্বের উপরে তাহা

প্রতিষ্ঠিত মানুষের জ্ঞান তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। আমি এতক্ষণ সেই তত্ত্বেরই আলোচনা করিয়াছি; সেই 'মহামানব'-বাদই মানুষের চিন্তার ইতিহাসে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ ও মৌলিক দান। এ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার গ্রন্থে যে একটি অতি মূল্যবান সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা এই—

"Did Buddha teach that the many was real and the ego unreal, while Orthodox Hinduism regards the One as the Real and the many as Unreal?" he was asked. "Yes," answered the Swami, "And what Ramakrishna Paramahansa and I have added to this is, that the Many and the One are the same Reality perceived by the same mind at different times and in different attitudes."

—আইনস্টাইনের Theory of Relativity-র তখনও জন্ম হয় নাই—এখানে আধ্যাত্মিক প্রশ্ন-মীমাংসায় এক বেদান্তবাদী সেই তত্ত্বের ঘোষণা করিতেছে।

বিবেকানন্দের কণ্ঠে সমগ্র বিশ্বের নবযুগের বাণী

বিবেকানন্দের বাণী শুধুই বাংলার নবযুগেব বাণী নয়—পৃথিবীতে যে নবযুগ আসন্ন হইয়াছে তাহারই বাণী। মানুষকে, মানুষের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা—বৈরাগ্যব্যাধিকে মানুষের মনের কোণ হইতেও দূর করিয়া এই জগৎকেই মহাতীর্থভূমিতে পরিণত করার যে প্রয়াস ইদানীন্তন কালে নানা আকারে দেখা দিতেছে, মানুষের শুধুই দুঃখ মোচন নয়, এই জীবনেই তাহাকে স্বমর্য্যাদা ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার যে আকুল কামনা জাগিয়াছে,—আমার মনে হয়, বিবেকানন্দই

তাহার প্রথম প্রফেট বা প্রবক্তা। মানুষ যে পাপী নয়—তাঁহার গুরুর এই মহাশিক্ষায় প্রবুদ্ধ হইয়া, হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ চিন্তার দ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া, এবং নিজের পৌরুষ-বিশ্বাসের অসীম শক্তি তাহাতে যুক্ত করিয়া, তিনিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিত্রাণ মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন; মানুষকে এমন দৃষ্টিতে পূর্ব্বে আর কেহ দেখে নাই। তাঁহার সেই মন্ত্র এক অভিনব শক্তি-মন্ত্র, মানুষকেই আত্মার অনন্ত শক্তির আধার বলিয়া বিশ্বাস করার মন্ত্র। তিনি বলিতেন, "I have never quoted anything but the Upanishads and of the Upanishads, it is that one idea, **Strength**"। এই শক্তিও মানুষের দুষ্প্রাপ্য বা সাধনলভ্য কিছু নয়; সে তাহার birthright, তাহার আত্মার জন্মগত অধিকার—প্রাপ্ত-প্রাপ্তির মত। অতএব এই শক্তিলাভ কালসাপেক্ষ নয়, কোনরূপ শিক্ষার দ্বারা তাহাকে ধীরে জাগাইতে হয় না; চাই কেবল চরিত্র-বল—দৃঢ় সংকল্প, তাহাতেই দুর্ব্বলতার বন্ধনপাশ নিমেষে ছিন্ন হইয়া যাইবে। কবি শেলীর উক্তি যদি এই হয় যে, "Man has but to will it, and there shall be no evil in the world" তবে বিবেকানন্দের উক্তি হইবে, "জগতে যত দুঃখ যত অমঙ্গলই থাক্, মানুষ যদি বলবান বীর্য্যবান হয়, তবে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না!" বিবেকানন্দের নিকটে এই শক্তির চেতনাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—অশক্তির নামই অজ্ঞান; এই শক্তি হইতেই যে প্রেমের জন্ম হয় তাহাতেই মানুষের মধ্যে দেবতার দর্শন হয়। কবিদের চিত্তেও তার এক পথে যখন সেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় তখন তাঁহারাও তাঁহাদের ভাষায়, সেই দিব্যদর্শনের আভাস দেন, সেও যেন এক একটি ঋক্‌মন্ত্রের মত—'the human face divine'; 'They seek no wonder but the human face',

অথবা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' ; ইহারই গভীরতর প্রেরণায় মানব-প্রেমিক সন্ন্যাসীও বলিয়া উঠেন—

"Above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races.

এই শেষের কথাগুলিতে মানুষের নামেই এ যুগের 'তারকব্রহ্ম-নাম' রচিত হইয়াছে। অধুনা যে নূতন মানবকল্যাণবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা যতই বিলক্ষণ বা বিসদৃশ হউক—জগদ্ব্যাপী যে অন্যায় ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান, তাহার ঘোষণা এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহ করে নাই ; সেই সমস্যাকেই বিবেকানন্দ সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম-দৃষ্টি অনুযায়ী তাহার সমাধান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এত গূঢ় ও ব্যাপক না হইলেও, তাহাতে জড়তত্ত্বের আস্ফালন অপেক্ষা মানুষেরই মাহাত্ম্য-বোধ ছিল—পূরা আধ্যাত্মিক না হইলেও তাহা অধ্যাত্মমুখী ছিল ; তিনিও মানুষের মনুষ্যত্বের উৎকর্ষকেই সর্ব্ববিধ জাগতিক উন্নতির মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তথাপি, বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা অতি গভীর ও আন্তরিক ভাবনার বিষয় ছিল, বিবেকানন্দ তাহার বাস্তব-মূর্ত্তিকে আরও প্রত্যক্ষগোচর করিয়া, কেবল উপায়-নির্দ্দেশ নয়—প্রতিকারের জন্য একটা কর্ম্মযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; তাহাই ছিল তাঁহার সকল কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। সত্য বটে, এই সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি জগৎ ও জীবনের একটা পারমার্থিক মূল্যই স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাতেও তিনি তাঁহার সেই দুর্দ্ধর্ষ অধ্যাত্মবাদকে মানবহিতবাদেরই অধীন করিয়াছিলেন। দুঃখকে স্বীকার করিলেও, তাহার দ্বারা মানুষের আত্মার পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না।

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্র ইহার বিপরীত ; সে মন্ত্র যেমন একান্ত-ভাবে অনাত্মধর্ম্মী এ মন্ত্র তেমনই আত্মধর্ম্মী ; প্রথমটিতে মানুষমাত্রের বাস্তবদশা-নিরপেক্ষ কোন মাহাত্ম্যই স্বীকার্য্য নয়, এবং ভিতরের সাম্য অপেক্ষা বাহিরের সমানাধিকারই সর্ব্বাগ্রে গণনীয়। তাহাতে দুঃখেরও কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নাই, অর্থাৎ তাহার অনুভূতি হয় দেহে—উহাও সামাজিক কুব্যবস্থার ফলে ঘটিয়া থাকে ; ঐ দুঃখদর্শনে যে দুঃখবোধ হয় তাহাও মিথ্যা, তাহাও অসুস্থ দেহের স্নায়বিক ব্যাধি মাত্র, অথবা, প্রকারান্তরে একরূপ আত্মপূজা ; এই 'আত্মা'ই সর্ব্ববিধ ভণ্ডামি ও প্রবঞ্চনার আবরণ ও আশ্রয়। অতএব এই তত্ত্ব ও ইহার প্রয়োগবিধি সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি ইহার উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, সমস্যার নিদান ও তাহার চিকিৎসা যতই বিসদৃশ হউক, এই সমস্যাই এ যুগের প্রধান সমস্যা, এবং বিবেকানন্দের জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মমন্ত্রের মূল প্রেরণা ছিল ইহাই। আজিও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক মুক্তিসাধনার যিনি কর্ম্মগুরু—তাঁহার ধর্ম্ম যেমনই হউক, কর্ম্মমন্ত্র প্রায় অক্ষরে অক্ষরে বিবেকানন্দের এই বাণীমন্ত্রের অনুবাদ ; অপরাপর ভারতবাসীর পক্ষে তাহা বিস্মৃত হওয়া বা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব নয়, কিন্তু বাঙালীও যে তাহা ভুলিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য! অতঃপর আমি বিবেকানন্দেব কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিব ; তাহাদের ভাষা ইংরেজী, তথাপি সেই ভাষারও মূল্য আছে, কারণ সেই ভাষাতেও বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন এমন পরিস্ফুট হইয়াছে যে, বাংলা অনুবাদে তাহার কিছুই থাকিবে না। তথাপি অনুবাদের হয়তো প্রয়োজন আছে। বিবেকানন্দের ভাষার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সম্যক পরিচয় এইরূপ বিচ্ছিন্ন বাক্যসমষ্টিতে মিলিবে না, নতুবা, তাঁহার ইংরেজী বক্তৃতাগুলি পাঠ

করিলে সকলেই মঃ রোলাঁর সহিত একমত হইবেন ; তিনি স্বামিজীর ভাষার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

His words are great music, phrases in the style of Beethoven stirring rhythms like the march of Handel choruses. I cannot touch these sayings of his...without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports must have been produced when in burning words they issued from the lips of the hero !

প্রথমেই বিবেকানন্দের এমন এক উক্তি উদ্ধৃত করিব, যাহাতে তাঁহার একটি, অতিশয় মৌলিক চিন্তা ব্যক্ত হইয়াছে—

Oh how calm would be the work of one who really understood the divinity of man. For such there is nothing to do save to open men's eyes. All the rest does itself.

তাহার পর—

He who does not believe in himself is an atheist.

* * *

One may desire to see again the India of one's books, one's studies, one's dreams. My hope is to see again the strong points of that India, reinforced by the strong points of this age, only in a natural way. The new state of things must be a *growth* from within. (এই শেষের বাক্যটি আজিকার দিনে বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য।)

* * *

And here is the test of truth—anything that makes you weak physically, intellectually and spritiually, reject as poison ; there is no life in it, it cannot be true.

* * *

Individuality is my motto, I have no ambition beyond training individuals.

* * *

No religion on earth preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism and no religion on earth treads upon the necks of the poor and the low in such a fashion, as Hinduism. Religion is not at fault, but it is the Phraisees and Saduceos.

* * *

If your brain and your heart come into conflict, follow your heart.

* * *

Man never progresses from error to truth, but from truth to truth.

* * *

The greatest men in the world have passed away unknown. Silently they live and silently they pass away ; and in time their thoughts find expression in Buddhas and Christs.

* * *

Fools put a garland of flowers around Thy neck, O Mother, and then stare back in terror and call Thee 'The Merciful'. (One realised the infinitely greater boldness and truth of the teaching that God manifests through evil *as well as* through good."
—Sister Nivedita.)

* * *

The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves. That faith calls out the Divinity within. As

soon as a man or a nation loses faith in himself, death comes. Believe first in yourself, and then in God.

* * *

Europe is on the edge of a volcano. If the fire is not extinguished by a flood of spirituality, it will erupt.

* * *

The next upheaval that is to usher in another era, will come from Russia or from China. I cannot see clearly which, but it will be either the one or the other. (ইহার অর্থ এই নয় যে, অতঃপর পৃথিবীতে, তথাকথিত কম্যুনিজম্ জয়ী হইবে।)

As I grow older, I find that I look more and more for greatness in little things...Anyone will be great in a great position, even the coward will grow brave in the glare of the footlights. The true greatness seems to me that of the worm doing its duty silently, steadily from moment to moment and hour to hour. (গীতার শ্লোকগুলি স্মরণীয়।)

* * *

Everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel. Do even evil like a man ! Be wicked, if you must, on a great scale !

* * *

A strong and true type is always the physical basis of the horizon. It is all very well to talk of universalism, but the world will not be ready for that for millions of years.

সর্ব্বশেষে আমি একটি অপূর্ব্ব কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—শুধু বাণী নয়, কাব্য-হিসাবেও ইহা অনবদ্য :

> Awake, arise and dream no more !
> This is the land of dreams, where Karma
> Weaves unthreaded garlands with our thoughts,

Of flowers sweet or noxious,—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of Truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth ! Be one with it ! Let visions cease.
Or, if you cannot, dream but truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবেকানন্দ-প্রচারিত মানব-ধর্ম্মের কয়েকটি মূল তত্ত্ব

বিবেকানন্দের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। যদিও সকল উক্তির মূলে এক কথাই আছে, তথাপি সেই একটি কথা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আমি আরও কয়েকটি নির্ব্বাচন করিয়া দিলাম।—

It is better not to believe than not to have felt.

*　　　*　　　*

Unity is the test of truth. Love is truth and hatred is false, because hatred makes for multiplicity.

*　　　*　　　*

Man has never lost his empire. The soul has never been bound. Believe that you are free and you will be !

*　　　*　　　*

The East worships simplicity and herein lies one of the main reasons why vulgarity is impossible to any Eastern people.

*　　　*　　　*

As soon as you say, you are a little mortal being, you are hypnotising yourself into something vile and weak and wretched.

*　　　*　　　*

Religion is neither word nor doctrine. It is to be and become, not to hear and accept. It is the whole soul changed into that which it believes.

*　　　*　　　*

Be like an arrow that darts from the bow. Be like the hammer that falls on the anvil. The arrow does not murmur if it misses the target. The hammer does not fret if it falls in the wrong place. The sword does not lament if it breaks in the hands of the weilder. Yet there is joy in being made, used and broken; and an equal joy in being finally set aside.

"Man has never lost his empire. The soul has never been bound"—ইহাই সেই বৈদান্তিক আত্ম-তত্ত্ব; তথাপি ইহা যে কেবল তত্ত্বমাত্র নয়—জগৎ ও জীবনের সহিত অসঙ্গতা রক্ষা করিয়া, যোগাসনে বসিয়া সেই তত্ত্বকে আত্মগত করাই যে পরম পুরুষার্থ নয়, বিবেকানন্দ তাহাই প্রচার করিয়াছেন; সেই তত্ত্বের বিদ্যুৎকে ধরিয়া মনুষ্যজীবন-রূপ শক্তিমন্ত্রে তাহাকে বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এ ব্যাপারে, বিশ্বাস—আত্ম-বিশ্বাসই—সর্ব্বশক্তির মূল; জগৎ হইতে এ ধরনের বিশ্বাস প্রায় লোপ পাইয়াছে; অথচ এই বিশ্বাস যে কত বড় শক্তি তাহা আমাদের এযুগের কবিও একবার ভাব-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

—'যখনি জাগিবে তুমি'—এই জাগাটাই যে সব! ইহার জন্য চাই বিশ্বাস, তাই কবিও সেই বিশ্বাসকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন—

এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি।

বিবেকানন্দ এই সত্যকেই একেবারে বাস্তব-জীবনের সাধনমন্ত্ররূপে, তাঁহার

নিজেরই চরিত্রে ও জীবনের দ্বারা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। নরেন্দ্রের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভবিষ্যৎ-বাণী অতিশয় মূল্যবান বলিয়া মঃ রোলাঁ উদ্ধৃত করিয়াছেন—আমিও ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি—তাহাও এখানে স্মরণীয়,—

His strong faith in himself will be an instrument to re-establish in discouraged souls the confidence and faith they have lost.

বিবেকানন্দও ইহাকেই উদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন. religion বা ধর্ম্মসাধনা বলিতে তিনি ইহাই বুঝিতেন,—"It is the whole soul changed into what it believes"। মনুষ্য-সাধারণ একই কালে একসঙ্গে এই পথে উঠিতে পারে না—এ পর্য্যন্ত কোন লোক-শিক্ষক বা জগৎ-গুরু তেমন আশা করেন নাই। কিন্তু একজন পুরুষের মধ্যেও যদি সেই সত্য দিব্যদীপ্তিমান্ হইয়া উঠে তবে আরও দশজন সেই জ্যোতির সান্নিধ্যে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিবে ; এবং—"The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves"। ইহাই ছিল বিবেকানন্দের ভরসা ও বিশ্বাস। যে আপনাকে এতখানি বিশ্বাস করে সে মানুষকে বিশ্বাস না করিয়া পারে না ; তেমনই, এত বড় আত্মবিশ্বাসীকে দেখিয়া মানুষও আপনাকে বিশ্বাস করিতে শেখে। বিবেকানন্দের বাণীর পশ্চাতে ছিল তাঁহার সেই শক্তি-ঘন পুরুষ-সত্তা—dynamic personality ; সে যেন জড়ত্বকে প্রবলভাবে আঘাত করিবার এক মূর্ত্তিমান ঘনীভূত চৈতন্য! নহিলে এ বাণীর কোন ব্যবহারিক মূল্য থাকিত না। ঠিক এই প্রসঙ্গে, সাময়িক-পত্রে উদ্ধৃত ডঃ মহেন্দ্রনাথ

সরকারের একটি মন্তব্য চোখে পড়িল, তাহা এই,—

The emergence of spirit from the bondage of nature is the desideratum in life's movement. But this emergence is a slow process ; the advent of a great soul by its spiritual influence can hasten the emergence, but a too swift process becomes fruitful in producing confusion and chaos.

—পড়িয়া মনে হয়, সরকার মহাশয় তত্ত্বহিসাবে যাহাকে স্বীকার করেন, তথ্য হিসাবে সে বিষয়ে তাঁহার কিছু সন্দেহ আছে। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, আমাদেরও হয়, তাই এত কথা লিখিতে হইতেছে। দার্শনিকের অপরোক্ষ-দর্শন নাই, তাই বিশ্বাসও নাই,—চিন্তার সূক্ষ্ম তন্তুজাল সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিতেই তিনি নিপুণ ; 'মায়ার বিচিত্র বসনখানি'র মূল্য যাচাই করিয়াই তিনি কৃতার্থ বোধ করেন, তাহাকে কিনিয়া পরিবার বা টানিয়া ছিঁড়িবার—জীবন-রহস্য-সাগরে অবগাহন ও সন্তরণ-শেষে তাহার তলে পৌঁছিবার—শক্তিও তাঁহার নাই, প্রবৃত্তিও নাই। কিন্তু এইরূপ দার্শনিক চিন্তশীলতারও প্রয়োজন আছে,—জীবনের অকূল অগাধ বারিরাশিতে ঝাঁপ দিয়া তাহারই তরঙ্গচ্ছন্দের সহিত্ নিজের প্রাণস্পন্দন মিলাইয়া সত্যের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা না থাকিলেও, চিন্তার সাহায্যে তাহার যে একটা পরোক্ষ পরিচয় আমরা তাঁহার নিকটে পাইয়া থাকি—আমাদের মত মানুষের তাহাই একমাত্র সম্বল। তাই সরকার মহাশয়ের উক্তির একাংশ আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট ; বাকিটা সত্য কিনা, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। আমার মনে হয়, সরকার মহাশয়ের ঐ আশঙ্কার মূলে কোনরূপ ভূত-দর্শন বা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আছে—তাহা বিবেকানন্দেরই সেই 'spiritual influence'-এর সদ্য ফলাফল-ঘটিত কি না জানি না ; আমি নিজে এতখানি ভয় পাইবার

মত ভূত-দর্শন করি নাই, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশা আছে ; আধুনিক যুগের সহিত যুক্ত করিলেও, আমি বিবেকানন্দকে আসন্ন ও অনাগত বৃহত্তর কালের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছি।

বিবেকানন্দের ধর্ম্মশাস্ত্র

বিবেকানন্দ 'চরিত্র'কেই মানব-ধর্ম্ম-সাধনায় সর্ব্বোচ স্থান দিয়াছেন ; 'মানুষ-গড়া'-(man-making)-ই ছিল তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। এই 'মানুষে'র সবচেয়ে বড় লক্ষণ—'manliness' বা পৌরুষ। অসীম আত্ম-প্রত্যয়, অদম্য কর্ম্মশক্তি এবং তাহার সহিত 'ত্যাগ' বা পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন—ইহাই বিবেকানন্দের ধর্ম্মশাস্ত্র। তত্ত্বহিসাবে ইহা হিন্দুর চিন্তায় নূতন নয়, পুরাতনই বটে ; কিন্তু সাধনমন্ত্র হিসাবে ইহা যে কত নূতন, তাহা আশা করি, এত কথার পর আর বুঝাইতে হইবে না। বিবেকানন্দ যখন বলেন—"Fight always, fight and fight on though always in defeat—that's the ideal" তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ইহাও সেই গীতার বাণী ; তথাপি ইহার ভাষা ও ভাব দুই-ই যে নূতন, তাহাতে সন্দেহ কি ? গীতায় আছে ভগবানে আত্মসমর্পণ —এখানে শক্তিও আমার শক্তি, কর্ত্তৃত্বও আমার। আবার বিবেকানন্দ যখন বলেন—

Worship Death ! All else is vain. That is the last lesson··· Yet this is not the coward's love of death, not the love of the weak or the suicide. It is the welcome of the strong man who has sounded everything to its depths, and *knows* there is no other alternative.

—তখনও তিনি চরম শক্তির আশ্বাসই দিতেছেন—অশক্তির নিরাশ্বাস নয়; ঐ চরম শূন্যতার মধ্যেই আত্মা যেন পূর্ণতায় টলমল করিতে থাকে! নিজের চরিত্রে ও জীবনে তিনি আত্মার এই যোদ্ধৃ-মনোভাব সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এ মনোভাব যে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়—বিবেকানন্দ 'চরিত্র' বলিতে যাহা বুঝিতেন, ইহা যে তাহারই লক্ষণ—তাহার প্রমাণ এক সৈনিক-কবির নিম্নোদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলিতে মিলিবে; এমন আশ্চর্য্য ভাবসাদৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই—

We have built a house that is not for Time's throwing,
We have gained a peace unshaken by pain for ever.
War knows no power. Safe shall be my going,
Secretly armed against all death's endeavour;
Safe though all safety's lost; safe where men fall;
And if these poor limbs die, safest of all.

ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের এই বীর-মনোভাব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া শেষে বলিয়াছেন—"Both victory and defeat would come and go. He was their witness"—আবার সেই গীতা! বিবেকানন্দের সেই উক্তিটিও এখানে স্মরণীয়—"Yet there is joy in being made, used and broken; and an equal joy in being finally set aside"; উপরি-উদ্ধৃত কবিতা-পংক্তিগুলির ভাবার্থ একই।

এই জন্য বিবেকানন্দের একমাত্র সাধন ছিল, 'Individuality'—মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও স্বশক্তির উদ্বোধন। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ ব্যক্তির আত্মাভিমান নয়, পূর্ব্বে সে আলোচনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে

এক মহামনীষীর উক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—

আপনারা Individualism বলিয়া একটি কথা শুনিয়াছেন—পশ্চিম সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে বস্তুটা সম্প্রতি আমাদের দেশে ভাসিয়া আসিয়াছে। ইহার অর্থ আপনাকে স্বাধীন ও বড করা, যাবতীয় নিয়ম ও সংযমের, আচারের ও নিষ্ঠার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্তি দিয়া বড করা। ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্র রোমান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; রোমান রাষ্ট্রনীতিমতে রাষ্ট্রের নিকটে মনুষ্যজীবনের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই। এই রাষ্ট্রনীতি পশ্চিমদেশে মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনকে পেষণযন্ত্রে নিপীডিত করিয়া আসিতেছে; ফলে, বিদ্রোহী মানবপ্রকৃতি চীৎকার করিয়া সকল সামাজিক, এমন কি, গার্হস্থ্য বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁডিয়া স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভে উৎসুক হইয়া পডিয়াছে। এ এক রকমের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বটে; কিন্তু বেদপন্থীর স্বাতন্ত্র্য বা Individualism সম্পূর্ণ অন্য রকমের। বস্তুতঃ আমার কাছে আমি যত বড, অন্য কেহ এত বড নহে—হইতে পারে না। বৃহদারণ্যক স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় আর কেহ নাই,—"পুত্রাৎ প্রেয়ঃ, বিত্তাৎ প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা"—আমার অন্তরের ভিতর এই যে আমি, সেই আমি পুত্র, বিত্ত আর সমস্ত হইতেই প্রিয়। পঞ্চদশী সংক্ষেপে বলিয়াছেন, "অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ"—এই যে আমি, ইহার চেয়ে প্রেমাস্পদ আর কেহ নাই, অতএব ইনিই পরম আনন্দ-স্বরূপ। আপনাকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র না করিলে ইহার সোয়াস্তি হইতে পারে না। এইরূপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে হইলে বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহাকে আত্মসাৎ, আত্মগত, আত্মস্থ করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু তার জন্য দুইটা পথ আছে। একটা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট নৈসর্গিক পথ—উহা বিরোধের পথ, এবং বিরোধ দ্বারা ভোগের পথ। প্রাকৃতিক নিয়মে বাহিরে যে কেহ আছে সকলেই আমার পর আমার শত্রু। তাহাকে দমন করিয়া, চিবাইয়া খাইয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে। প্রত্যেক পশু তাহাই

করিতেছে।...আচার্য্য হক্সলী ইহাকে cosmic prócess-এর কোঠায় ফেলিয়াছেন। ইহাতে মানুষের কোন বিশিষ্ট গৌরব নাই। জগৎটাকে নিংড়াইতে গেলে যে ছিবড়া অবশিষ্ট থাকে, তাহার অবর্জ্জনার ক্লেদে জগৎটাই পূর্ণ হইয়া উঠে। এমন জগতে তিষ্ঠিয়া কোন লাভ নাই। হক্সলী যাহাকে ethical process বলিয়াছেন তাহার সহিত এই cosmic process-এর সনাতন বিরোধ। এই নৈসর্গিক cosmic process-কে পরাভূত করিয়া ethical process-কে প্রতিষ্ঠিত করাই মানুষের বিশিষ্ট কর্ম্ম।...

প্রত্যেক মনুষ্য-পশু এইরূপে জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে, ইহাই তাহার নৈসর্গিক প্রকৃতি। কিন্তু মনুষ্য-পশুর ভিতরে আর একটা মানুষ গোপনে বসিয়া আছে সে কেবলই না—না—না—না, বলিতেছে।...... ইনিই সেই আসল মানুষ, প্রজাপতি—যিনি 'চরতি গর্ভে অন্তঃ'। ইনি বলিতেছেন, আমি বিশ্বযজ্ঞে আমাকে দান করিয়া আপনাকে বড় করিয়াছি—জগৎকে চিবাইয়া আত্মসাৎ না করিয়া আপনাকে ছড়াইয়া জগতে বিলাইয়া দিয়াছি, আপনাকে এইরূপে সম্প্রসারণ করিয়া বড় হইয়াছি। ইহা ত্যাগের পথ—এবং ত্যাগের দ্বারা মিলনের পথ। এইরূপ উল্টা পথে আপনাকে পরে মিশাইয়া, পরকে আমি আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করিয়াছি—আমার নিকটে পর নাই; এইরূপেই আমি পরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছি। ইহাই খাঁটি Individualism; কেন না, সমস্ত পর আত্মস্থ হইয়া গেলে—পরাধীন পরবশ হইবার সম্ভবনা পর্য্যন্ত থাকে না। [রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যজ্ঞকথা, পৃঃ ১৭৮-৮০]

এই যে আত্মোপলব্ধি বা স্বাতন্ত্র্য-মহিমার দিব্যানুভূতি—যাহাদের ইহা হইয়াছে, তাহারাই ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তি-স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়াছে। কিন্তু সেই অসীম আত্মস্ফূর্ত্তির এমনই গুণ যে, সে অবস্থায় আত্মা স্ববশেই বিশ্ব-যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়া থাকে। বিবেকানন্দ আত্মার সেই পূর্ণতা প্রাপ্তিকেই তাহার প্রকৃত 'Individuality' বা স্বরূপ-মহিমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তবু সেই এক প্রশ্নের উত্তর চাই—আত্মার এইরূপ সম্প্রসারণ কি সাধারণভাবে আদৌ সম্ভব? বিবেকানন্দ তাহাই বিশ্বাস করিতেন, কেন করিতেন তাহাও বলিয়াছি,—সে বিশ্বাস তাঁহর নিজের আত্ম-বিশ্বাসের বিশ্বাস, কেবল জ্ঞান বিচারের বিশ্বাস নয়। একজন মানুষের পক্ষেও যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে সকলের পক্ষেও অন্তত অসম্ভব নয়। পদার্থমাত্রেই যে অগ্নি বা বিদ্যুৎ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাকে প্রকট করিবার উপায় চাই। ব্যক্তি, বা গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে, সেই প্রেরণা সঞ্চার করা সাধ্য ও সম্ভব; আত্মার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। ব্যক্তির জীবন বা জাতির জীবনে যাহা দৈবাৎ নৈমিত্তিক-ভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহাকে নিত্য করিয়া তুলিবার পন্থাও আছে—বিবেকানন্দ সেই পন্থার প্রদর্শক। ব্যক্তির পক্ষে এমন জাগরণ যে সম্ভব তাহা আমরা দেখিয়াছি; কলিকাতার রাজপথে ড্রেনের গহ্বরে নফর কুণ্ডুর সেই আত্মবিসর্জ্জনের ঘটনা এখনও ভুলি নাই। একজন অতি-সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মার সেই দিব্যপ্রকাশ নিবিড় অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া নিবিড় অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে! বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে, জাতি-গতভাবে, তাহারই আর এক প্রকাশ আর এক-রূপে দেখিলাম; সেই অতি-প্রবুদ্ধ আত্মাই ষ্টালিনগ্রাডের গগনস্পর্শী জ্যোতিঃশিখায় সারা ইউরোপ আলোকিত করিয়াছে; সেই শক্তি, সেই বীর্য্যও কম আধ্যাত্মিক নয়,—অনাত্মবাদী নাস্তিকেরা তাহার যে অর্থই করুক; সে দৃশ্য দেখিলে বিবেকানন্দও আনন্দে আত্মহারা হইতেন। অধ্যাত্মবাদী সন্ন্যাসীর এই বাণী, শুধুই জীবনের ঘটনায় নয়—সাহিত্যিক কবি-সাধকের ধ্যানেও ধরা দিয়াছে, সে প্রমাণও আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি, চিন্তাবিষ-জর্জ্জর ম্যাথ্যু আর্নল্ড ইহাকেই আত্মার একমাত্র মুক্তিপন্থা বলিয়া অনুভব

করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া একজন মনীষী সমালোচক বলিতেছেন—

To be oneself, to possess one's own soul,—this, Arnold knew, was the necessity; if this could be achieved, belief could be achieved and an end of perturbation.

"Resolve to be thyself; and know that he
Who finds himself loses his misery."

রুশ সাহিত্যিক চেহভের (Anton Tchehov) এই কথাগুলিও বিবেকানন্দের সেই বাণীমন্ত্রের অনুরূপ—

I believe I see salvation in individual personalities scattered here and there all over Russia—whether they belong to the intelligentsia or to the peasants.

ইহার পরেই বলিতেছেন—

This feeling of personal freedom is the mark of the true and completed individuality. Such individuals are the pioneers of humanity, and on them the future of true civilisation does indeed depend.

এ যেন বিবেকানন্দের ভাষায় বিবেকানন্দেরই বাণী! রুশীয় মনীষী যাহাকে তথ্যরূপে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ভারতীয় দৃষ্টিতে তাহার গভীরতর তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; চেহভ যাহা অনুমান করিয়াছেন, বিবেকানন্দ মন্ত্রদ্রষ্টার মত তাহাকে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে জগতের কি উপকার হইয়াছে বা হইবে, সে প্রশ্ন এখন মুলতুবি থাকাই উচিত। বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর, এই পঞ্চাশ বৎসরে, জগৎময় মানুষের ব্যাধি যে আকার ধারণ করিয়াছে—যে আগুন তাহার মস্তিষ্কে জন্মলাভ করিয়াছে, এবং যাহার ফলে মনুষ্যত্বের চেতনাই

এক্ষণে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, সেই আগুন প্রশমিত হইবার পূর্ব্বে কোন সত্যই স্থিতিলাভ করিবে না ; অতএব এখন সকল প্রশ্নই বৃথা।

বঙ্কিমযুগের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই নবযুগের সহিত বিবেকানন্দের বাণী নিঃসম্পর্কিত নয়। সে যুগের ভাবধারার যে গতি ও প্রবৃত্তির আলোচনা আমি এ যাবৎ করিয়া আসিতেছি, তাহা বিবেকানন্দে আসিয়াই একরূপ শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছে ; তাঁহার বাণী সেই যুগকে যতই অতিক্রম করুক, ধারা সেই একই—কেবল কূল ছাপাইয়াছে মাত্র। সে যুগের সমস্যা ছিল মুখ্যত বাংলার এবং গৌণত ভারতের ; বাঙালীর প্রতিভাই সেই যুগকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া, জীবনের একটা নূতন অর্থ—একটা নূতন পথ ও পাথেয়-সন্ধানে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সমস্যা কি তাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহার সমাধানে কল্পনা, মনীষা ও পাণ্ডিত্যের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় বঙ্কিমের প্রতিভাকে সৃষ্টি-সাফল্যে মণ্ডিত করিয়াছিল, এবং তাহাতে সেই যুগ যে তাহার সকল প্রবৃত্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি সুসম্পূর্ণ মূর্ত্তি লইয়া বাঙালীর চিত্তে, তথা সাহিত্যে, প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। জাতি-হিসাবে বাঙালীর যে নব-জাগরণ সে যুগের সাধনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ ফল তাহার নিদর্শন—বঙ্কিম-সাহিত্য। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তুলনা করিলেই বিবেকানন্দের সহিত সে যুগের সম্পর্ক কতটুকু ও কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। দুইটি বিষয়ে উভয়ের মিল খুব স্পষ্ট—প্রথম, প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্য সংস্কৃতির সমন্বয় বা যোগস্থাপন ; দ্বিতীয়, স্বজাতি-সমাজের চৈতন্য-সম্পাদন। প্রথমটির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে প্রয়াস তাহাতে আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি—ভারতীয় জ্ঞান-

গরিমা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার যে গভীর শ্রদ্ধা সেই শ্রদ্ধার মূলে ছিল—ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব ; তিনি ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাহাকে যাচাই করিয়া। এজন্য, তিনি যে নব মানব-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার আধ্যাত্মিকতাও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, তিনি পারমার্থিক অপেক্ষা ব্যবহারিক দিকটাই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন—যুগের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনকে মানিয়া লইয়াছিলেন ; যুগ ও জাতির সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি ছিল বাস্তব। হাতের কাছেই যে উপাদান আছে তাহা দ্বারা প্রয়োজন-অনুযায়ী একটা কিছু গড়িয়া লইতে হইবে, কবি ও মনীষী বঙ্কিম ইহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অথচ বঙ্কিম যে কতবড় আদর্শবাদী ছিলেন তাহাও আমরা জানি ; সেই আদর্শকেই বাস্তবের অধীন করিবার যে শক্তি, তাহাই বঙ্কিমের *সৃষ্টি-শক্তি* ; এই *সৃষ্টি-শক্তি* তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনায়—কবিকর্ম্মে যেমন, জ্ঞান-গবেষণার কর্ম্মেও তেমনই—পরিস্ফুট হইয়া আছে। উপকরণ যত সামান্য হউক, আদর্শ যতই দুরধিগম্য হউক, বাস্তবে ও কল্পনায় যতই বিরোধ থাকুক, তথাপি তাহারই সাহায্যে একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার মত আর কাহারও ছিল না। তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিরোধ-মীমাংসায় তিনি আশ্চর্য্য বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন ; একের গৌরব-উদ্ধারেও অপরের মূল্য স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের মনোভাব কিছু স্বতন্ত্র ; তিনি য়ুরোপীয় জাতি-সকলের সাধনার বৈশিষ্ট্য ও মূল্য স্বীকার করিলেও, ভারতের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন, এবং উভয়কে পৃথক রাখিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনিও অবজ্ঞা করেন নাই এবং বঙ্কিমের মতই তাহার অনুশীলন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন—বুদ্ধিকে জাগ্রত এবং জ্ঞানকে সপ্রতিভ রাখিবার জন্য তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত তত্ত্বকে ভারতীয় সাধনার অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি 'এভল্যুশন'-বাদ মানিতেন না—বঙ্কিম প্রায় পূরাপূরি মানিতেন। তিনি আত্ম-তত্ত্বকেই সকল তত্ত্বের উপরে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া, যে 'progress' বা 'প্রগতি'র সংস্কার য়ুরোপীয় চিন্তায় বদ্ধমূল, তাহাতেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না ; একবার ভগিনী নিবেদিতার একটি অভিযোগের উত্তরে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"That's because you cannot overcome the idea of progress, but things do not grow better They remain as they are, and *we* grow better by the changes we make in them."—ইহা সত্যই বড় ভয়ানক কথা।।

এ সম্বন্ধে আমি খাঁটি হিন্দু মনোভাবের আর একটু পরিচয় দিব—পাঠকগণ দেখিবেন, তাহা আরও ভয়ানক। মনুষ্যসমাজের উন্নতি-সাধন নয়—হিত-সাধনই হিন্দু চিন্তায় অনুমোদিত। ওই উন্নতির একটা মাপ-কাঠি অনুসারে, জাতি বা ব্যক্তিসকলের উচ্চ-নীচ ভেদ হিন্দুর তত্ত্ব-জ্ঞানের বিরোধী। নবপ্রকাশিত একখানি অভিনব ও উপাদেয় বাংলা পুস্তক হইতে আমি ইহার প্রমাণ দিব—প্রত্যেক সত্যপিপাসু ও আত্মজিজ্ঞাসু শিক্ষিত বাঙালীকে আমি এই পুস্তক পাঠ করিতে বলি—বর্ত্তমান যুগে এই ধরনের পুস্তক 'টনিকে'র মতই স্বাস্থ্যকর। পুস্তকখানির নাম—'তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' গ্রন্থকারের নাম শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই পুস্তকের এক স্থানে এক অঘোরী তান্ত্রিকের মুখে যে কথাগুলি বাহির হইয়াছে, আমি নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইবে—আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐ উন্নতিবাদ

ভারতীয় সাধনার একটা মূলতত্ত্বের বিরোধী। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাহা হইলে, তিনি কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে জ্ঞানমার্গী উদাসীন হইয়া শ্মশানে বা গিরিগুহায় বাস করিতেন।

"তোদের কেবল উন্নতি আর উন্নতি; উন্নতি কি সকলের এক ভাবেই হয়? এর মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা এখানে কোন উন্নতি অবনতির উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি, কেবল কর্ম্মক্ষয় করতে এসেছে। আত্মার ক্ষুধা যার যেমন তার সেই রকম ভোগ আর কর্ম্ম এখানে চলবে ও ?···লোকচক্ষে—অন্ততঃ তোদের মত লেখাপড়া-জানা বাবুলোকদের চক্ষে, হয়ত তা খারাপ ঠেকবে, কিন্তু তাদের হিসেবে তারা ঠিক আছে।···

একটা কথা মনে রাখবি, কখনো ভুলিস নি, - কারও উন্নতি বা অধঃপতন নিয়ে বিচার করতে যাস্ নি, আর প্রচারও করিস নি কখনো,— তাতে তোর ক্ষতি হবে, নিজের কিছুই সুবিধা হবে না। এখানে যা কিছু দেখবি বা শুনবি তার থেকে একটা মনগড়া সহজ সিদ্ধান্ত করে নিয়ে কারো কাছে কিছু বলিস নি, ঠকে যাবি। যত জীব দেখছিস—যারা জীবনের ধারা পেয়ে গেছে—তাদের সকলের মধ্যেই একটা করে পৃথিবী আছে। জ্ঞানী, মহৎ ব'লে তুই যাদের কর্ম্মের কতকটা দেখেছিস তাদেরও যে রকম—অজ্ঞান, হীনবুদ্ধি, মূর্খ, কুক্রিয়াসক্ত ব'লে যাদের দেখছিস, তাদেরও সেই রকম—সকলকারই এক একটা আলাদা পথ আছে, যার মধ্যে দিয়ে সে খেলা করছে—আপনাকে প্রকাশ করছে। (পৃঃ ২২২)

অতএব মূল তত্ত্বের দিক দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কোন সত্যকার রফা হইতে পারে না, ইহা বিবেকানন্দ বুঝিতেন। তথাপি য়ুরোপের বিশিষ্ট সাধনাকে শ্রদ্ধা করিতেও কোন বাধা ছিল না; প্রত্যেকের পথ পৃথক হওয়াই তো স্বাভাবিক; যাহার যে পথ সে সেই

পথেই অগ্রসর হউক—শেষে সেই এক তীর্থেই পৌঁছিবে। তথাপি বিবেকানন্দের এ অভিমান ছিল যে, সে তীর্থ ভারতেই আছে,—শেষে সকলকে সেখানেই পৌঁছিতে হইবে। এরূপ অভিমান বঙ্কিমেরও ছিল; কিন্তু তিনি উপস্থিত একটা রফা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি বিবেকানন্দের মত এত বড় অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না,—কেবল আধ্যাত্মিক শক্তির উপরেই নির্ভর করিতে পারেন নাই বলিয়া একটু পাটোয়ারী বুদ্ধি রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, হিন্দুধর্ম্মের উপরে বহুকাল ধরিয়া যে আগাছার জঙ্গল জন্মিয়াছে, তাহা কাটিয়া দূর করিবার একমাত্র অস্ত্র—য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান; তাহা ছাড়া ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে মতি-গতি হইয়াছে তাহাকেও যথাসম্ভব অনুকূল রাখাই শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের কোন দ্বিধা-সংশয় ছিল না; ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন—

To his mind Hinduism was not to remain a stationary system, but to prove herself capable of embracing and welcoming the whole modern development...Above all she was the holder of a definite vision, the preacher of a definite mission among nations.

—অর্থাৎ, এমন কোন নূতন তত্ত্ব বা মতবাদ নাই যাহার সহিত হিন্দু-চিন্তার রফা করিতে হয়; তাহা এমনই সর্ব্বাশ্রয়ী যে, কিছুরই সহিত তাহার বিরোধ হইতে পারে না তাহার মত করিয়া সে সকলকে হজম করিয়া লইবে; এবং তাহার নিজস্ব সত্য-সম্পদ—যে বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টি আছে—তাহাই জগৎকে দান করিবে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সহিত বঙ্কিমের মত-ভেদ ছিল না বটে, কিন্তু চিন্তাপদ্ধতি ও সাধন-রীতিতে বিশ্বাস-ঘটিত তারতম্য ছিল।

দ্বিতীয় বিষয়—স্বজাতির উদ্ধার-সাধন। এখানেও উভয়ের বাসনা এক হইলেও, আদর্শ এক ছিল না। এই উদ্ধার-সাধন বিবেকানন্দের নিকটে কোন পৃথক সমস্যার মত ছিল না; তাহার জন্যও তিনি সেই এক মন্ত্র —আত্মার মুক্তিমন্ত্র ছাড়া, আর কোন উপায় চিন্তা করেন নাই। বঙ্কিম-চন্দ্র স্বাজাত্য-সাধনাকেই জাতির মুক্তিলাভের অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়া—ভারতবর্ষে যাহা সম্পূর্ণ নূতন—সেই জাতীয়তা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শ তদপেক্ষা উন্নত ও উদারতর, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি, বিবেকানন্দের সেই আধ্যাত্মিক শক্তিসাধনা এবং এই সাধারণ মানবধর্ম্ম-সাধনার একত্র বিচার করিয়া মঃ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

This message of energy (বিবেকানন্দের) had a double meaning; a national and a universal. Although for the great monk of the Advaita, it was the universal meaning that predominated, it was the other that revived the sinews of India. (ইহা আমরাও জানি; অন্তত বাংলাদেশে—জাতীয়-জাগরণের এই আদি অরুণোদয়ের দেশে··· বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী বিবেকানন্দের মন্ত্রে অধিকতর শক্তি লাভ করিয়াছিল)। There was ground for fearing that its high spirituality would be twisted to the profit of a purely animal pride in race or nation, with all its stupid ferocities,

কিন্তু তাহার পরেই বলিতেছেন—

'But how else was it possible to bring about within the disorganised Indian masses a sense of human unity, without first making them feel such unity within the bounds of their own nation?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক ইহাই ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার 'বন্দেমাতরম্'

গানের উদ্দিষ্ট দেবতা যে ভারতভূমি নয়—বঙ্গভূমি, ইহাতেও তাঁহার বাস্তব-দৃষ্টি, মানব-চরিত্র ও ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে! প্রেমের উদ্দীপন, বাস্তবের ক্ষেত্রে, অতিশয় নিকট বস্তুতেই হইয়া থাকে; স্বসমাজ ও স্বজাতি আগে, বৃহত্তর সমাজ পরে, এ তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ভালরূপই জানিতেন। বিবেকানন্দের প্রেম কত বড় গভীর ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার মূলে ছিল ভারতীয় সাধনার প্রতিই ঐকান্তিক অনুরাগ, তাই ভারতীয় জনগণের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া তিনি সমগ্র ভারতের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। অতএব এই দুই জনের ব্রত যে দুইরূপ—তাহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক; কারণ, একজন ছিলেন সন্ন্যাসী, আর একজন সমাজধর্ম্মী গৃহস্থ। এই দুই ধর্ম্মই সত্য—এক অপরের পরিপূরক মাত্র। এ বিষয়ে সে যুগের এক মনস্বী বাঙালী লেখকের উক্তি বড়ই যথার্থ, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব—বিবেকানন্দের ভারতপ্রীতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি এই দুই-ই যে সমান সত্য ও সমান আবশ্যক, এই উক্তি যেন তাহারই সমর্থন করিতেছে।—

"তোমার ইংরাজ বা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, undefined and indefinite units, অর্থাৎ, নির্দ্দেশশূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন ব্যষ্টি লইয়া কখনও কোন সমষ্টির সৃষ্টি হয় না—একথা সম্ভবপর নহে। আমাদের স্মার্ত্তগণও তাহাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাবে বা মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়জন দ্রাবিড় হইবে না—দ্রাবিড়ের আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সজীব করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই বাঙ্গালা ভারতব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, তোমার বাঙ্গালা দেশকে আগে সামলাও; পরে গোটা

ভারতের ভাবনা ভাবিও। মনে নাই কি, সন্ন্যাসীর সেই কথাটা! তিনি বলিয়াছেন, ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী ও যতি-সজ্জনে ভাবিবে; প্রদেশের ভাবনা গৃহস্থে ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের মত মান্য করি।"

এ চিন্তা এ ভাবনা এ যুগে একেবারে 'out of date' হইয়াছে—বাঙালীরও চিন্তাশক্তি আর নাই; তাহার কারণ, সত্যকার বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষাও আর নাই!

আরও কয়েকটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিবেকানন্দের তুলনা করা যাইতে পারে। দুই জনেই 'পলিটিক্স্' বা রাষ্ট্রনীতি-চর্চ্চার বিরোধী ছিলেন, আজিকার দিনে ইহা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। একজনের মতে উহা ধর্ম্মই নহে, আর একজন উহাকে পরধর্ম্ম বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোনরূপ মন্তব্য করা শোভা পায় না; কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল আমরা ক্রমে 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' বলিয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়াছি, তাহা যে এখনও আমাদের ধাতুগত হয় নাই, বরং তাহার ফলে আমাদের শক্তি অপেক্ষা অশক্তিই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপাতদৃষ্টিতে আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝি—মহাপুরুষের দিব্য-দৃষ্টিতে তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আশঙ্কার কারণ আছে। কেবল ইহাই লক্ষণীয় যে, এ বিষয়ে এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারার ঐক্য আছে। তারপর, এ যুগের যাহা প্রধান প্রবৃত্তি—যাহা এই যুগেরই নবধর্ম্ম—সেই Humanity বা মানব-পূজা, বা মানবাত্মার মহত্ত্ব-বোধ উভয়কেই সমান অনুপ্রাণিত করিয়াছে; বঙ্কিমে যাহার প্রথম পূর্ণ ও সজ্ঞান উপলব্ধি,

বিবেকানন্দে তাহা উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে। "We Indians are MAN-worshippers. Our God is Man"—বিবেকানন্দের এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় প্রতিধ্বনি বলিলেও হয়,—বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' এই 'মানব-ভগবৎ'-বাদের একটি সুনিপুণ ভাষ্য মাত্র। কেবল একটা বিষয়ে দুইয়ের দৃষ্টিতে প্রভেদ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে, মানুষের প্রকৃতিসুলভ যে মনুষ্যত্ব—তাহার সেই দেহ-মন-প্রাণের ধর্ম্মকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং সেই জন্য পূর্ণ-মনুষ্যত্ব-লাভকে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা বা সর্ব্ববৃত্তির অনুশীলন-সাপেক্ষ করা হইয়াছে। এইরূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যায়াম ব্যতিরেকেও, তথাকথিত জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চার অভাবেও, অন্য উপায়ে মানুষের আত্মা যে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব তাহার যেন প্রতিবাদী। ইহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দের মত, আত্মার স্বাতন্ত্র্য-মহিমায় (বিবেকানন্দের 'Individuality') বিশ্বাস করিতেন না; ছোট-বড় সকল মানুষের মধ্যেই সেই এক শক্তি-বীজ নিহিত আছে, তাহার স্ফুরণ যে সর্ব্বাবস্থাতেই সম্ভব—সামাজিক অবস্থা বা মানসিক উৎকর্ষের উপরে তাহা নির্ভর করে না; চরিত্র-বলই যে চিত্তশুদ্ধির নিদান, এবং তাহা অশিক্ষিতের মধ্যেও সুলভ,—বঙ্কিমচন্দ্রের 'Doctrines of Culture' তাহা গ্রাহ্য করে নাই। এজন্য তিনি একরূপ Intellectual aristocracy-র সমর্থন করিয়াছেন। বিবেকানন্দও কম aristocrat নহেন, কিন্তু তাঁহার aristocracy আত্মার aristocracy, তাই তাহা ডেমোক্রেসিরও চূড়ান্ত।

উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র যদি সে যুগের প্রকৃত প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে বিবেকানন্দ সেই যুগকে

অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র—তাহার সেই ধারাকে তটবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সাগরসঙ্গমে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বিবেকানন্দও সেই যুগেরই সন্তান, তাঁহার ধাতুপ্রকৃতিতেও সেই যুগের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল ; তাঁহার বালক-বয়সের সেই বিদ্রোহী মনোভাব সেই যুগেরই লক্ষণ। কেবল, তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্রে যে অসাধারণ পৌরুষ সুপ্ত ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের যাদু-স্পর্শে তাহা এমনই স্ফুরিত হইয়াছিল যে, তিনি অনায়াসে যুগকে অতিক্রম করিয়া, বৃহত্তর দেশে ও কালে আপনাকে প্রসারিত করিতে পারিয়াছিলেন। সেকালে ইহা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না—বিবেকানন্দের পক্ষেও নয় ; কারণ, ইহা ঐতিহাসিক কালধর্ম্মে—বা স্বভাবের নিয়মে—ঘটে নাই। তথাপি, ইহাও সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ উভয়েই বাঙালী—উভয়ের প্রতিভা বাঙালী-প্রতিভা ; উভয়ে একই যুগের একই জল-মাটির মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণও সেই জল-মাটির বটে (বাঙালী না হইলে এমন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের রস-রসিকতা সম্ভব হইত না), কিন্তু তিনি সকল যুগের। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ-চেতনা এই যুগাতীতের স্পর্শ লাভ করে নাই—বিবেকানন্দের করিয়াছিল। তাই উভয়ের মধ্যে বাঙালীর ধাতুগত সেই শাক্ত-সংস্কার জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও, একজনের সংস্কার খাঁটি, আর একজনের তেমন খাঁটি নয়—মিশ্র। বিবেকানন্দ বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মকে গুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গে—লীলায় নয়—সংগ্রামে অবতীর্ণ করিয়া, বন্ধন-ছেদনের আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্যই বন্ধনকে স্বীকার করিয়া—আত্মার কর্ত্তৃত্ব-শক্তির (dynamic energy) জয়ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, খাঁটি শাক্তের মত, প্রকৃতির উপাসনা করিয়া তাহারই পথে, পশ্বাচার হইতে দিব্যাচারে আরোহণ করাকেই সহজ ও সাধ্য মনে করিয়াছিলেন।

একজনের সাধন পীঠ—আত্মা, আর একজনের—দেহ ; একজন মৃতকেও জাগাইবার জন্য ডাক দেন—"Lazarus, come forth!", আর একজন মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার জন্য তাহার দেহে বৈদ্যকশাস্ত্র অনুসারে তাপসঞ্চারের চেষ্টা করেন ; একজনের মতে—"The soul is the cause of thė body", আর একজনের মতে—"The body is the cause of the manifestation of the force we call the soul" ; যদিও ঐ 'soul' উভয়ের নিকটেই সমান সত্য। তথাপি উভয়েই শাক্ত ; বিবেকানন্দ তাঁহার ধর্ম্মকে 'dynamic religion' বলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই dynamism-কে তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনের ভিত্তি করিয়াছেন ; প্রভেদ এই যে একজন প্রকৃতিপন্থী হইলেও যুক্তিবাদী, অতিশয় নিয়মতান্ত্রিক, তাই 'morality'র উপরে উঠিতে পারেন নাই ; আর একজন অধ্যাত্মবাদী, তাই সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণু ; তাঁহার ধর্ম্মে, আত্মা আত্মা-ছাড়া আর কিছুরই বশীভূত নয় ; morality প্রভৃতি 'custom' মাত্র—'character'ই সব। কিন্তু কেহই বিনাযুদ্ধে জয়লাভের কথা বলেন নাই ; 'পথ-চলার আনন্দ' নয়—পথ-চলার দারুণ বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-বিভীষিকাকে অপসারিত করিবার যে শক্তি তাহার সাধনাকেই একমাত্র সত্য-সাধনা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে এই তত্ত্বের রস-রূপ ট্র্যাজেডির আকারে প্রকটিত করিয়াছেন ; বিবেকানন্দও 'মায়া'কে নস্যাৎ করিতে পারেন নাই, বরং সেই মোহিনী তাঁহার বাঙালী-প্রাণকে কিঞ্চিৎ অভিভূত করিয়াছিল, নতুবা তিনি এত বড় প্রেমিক হইতে পারিতেন না। মঃ রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দের নূতনতর মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিবার ছলে লিখিয়াছেন—

Nothing in the world is to be denied, for, Maya, illusion, has

its own reality. We are caught in the network of phenomena. Perhaps it would be a higher and a more radical wisdom to cut the net, like Buddha, by total negation, and to say : "They do not exist." But in the light of the poignant joys and tragic sorrows, without which life would be poor indeed, it is more human, more precious to say : They exist. They are a snare.

—বাঙালী কবি ও বাঙালী সন্ন্যাসী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই ; "They exist. They arc a snare"—বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলিও এই আর্ত্ত-ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। অতএব, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমের মধ্যে যাহা কিছু পার্থক্য তাহা মাত্রাগত ; বিবেকানন্দ বঙ্কিম-যুগের প্রবৃত্তিকে বিপরীত-গামী করেন নাই, তাহার সেই ধারাকেই সহসা এক গভীরতর খাতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালী আর কোনও চিন্তা করে নাই —নূতন যুগের নূতন অবস্থার সঙ্গে, নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সামঞ্জস্য সাধনই, তাহার সকল কর্ম্ম চিন্তা, সকল ভাবুকতার মূলে ছিল। জাতির অধঃপতনও যেমন গভীর, পরিত্রাণের আদর্শও তেমন উচ্চ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রামমোহনের মনীষা সেই সমস্যাকে প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, ইহাই রামমোহনের কৃতিত্ব। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির জড়তা প্রদর্শন, যুক্তি বিচারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ছাড়া তিনি অধিক কিছু করিতে পারেন নাই। কেবল যুক্তিবিচারসিদ্ধ মতবাদের দ্বারাই একটা জাতির হৃদয় বা চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না—

চাই প্রেম, চাই তপস্যা ; জীবনে তাহারই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই সেই আলোক মানুষের প্রাণে ও মনে বিকীর্ণ করা।

কেশব দ্বিতীয় যুগের যুগন্ধর। তিনি নবজীবন সৃষ্টির কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন—তিনি সে যুগের প্রথম প্রেমিক। কিন্তু কেশবের প্রেমও জাতীয় জীবন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতির সিদ্ধি লাভ করিল না। ধর্ম্মপ্রচারক কেশবচন্দ্রের মন্ত্র জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রহরেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। কেশব নিজেও শেষে সকল বিধি, সকল বিধান উত্তীর্ণ হইয়া, নিজের প্রচার-ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-প্রচারেরও বহু ঊর্দ্ধে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে, জাতীয় জীবন-যজ্ঞে প্রথম অগ্ন্যাধান করিয়াছিলেন কেশব। তাঁহার প্রচার-কর্ম্মের অপূর্ব্ব উন্মাদনা, নূতন ভাবচিন্তাকে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানে রূপ দিবার আশ্চর্য্য সৃজনী-শক্তি, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ব্যক্তিত্ব—কেশব-বিরোধী সম্প্রদায়কেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি কত কর্ম্মীকে পথ দেখাইয়াছে। সে যুগের যে বাঙালী কবি মহাকাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, আমার মনে হয় তিনিও কেশবীয় ভাবের ভাবুক। "এক ধর্ম্ম, একজাতি, এক ভগবান"—এই মহাবাক্য প্রচারকল্পে, যিনি নূতন করিয়া, বাঙালীর জন্য মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সেই কবি নবীনচন্দ্রও কেশবের বাণী হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

আরও মনে হয়, কেশবের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে যে আর এক মহাপুরুষ এই জাতির জীবন-যজ্ঞে শেষ আহুতি দিয়াছিলেন, সেই বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার প্রচার-প্রণালী ও কর্ম্মপদ্ধতিতে

কেশবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা কেশব তাঁহার 'জীবন-বেদে' উল্লেখ করিয়াছেন, ভাবের সেই উৎসাহ কর্ম্মোন্মাদনার সেই উত্তাপ বিবেকানন্দের জীবনেও অপরিমিত।

কিন্তু বিবেকানন্দ কেশবের পরবর্ত্তী হইলেও অনুবর্ত্তী নহেন। তাঁহার গুরুমন্ত্র ও তাঁহার বাণী স্বতন্ত্র। বিবেকানন্দের কর্ম্মজীবনের আদর্শে কেশবের ছায়া কতকটা সংক্রামিত হওয়া অবশ্য অসম্ভব নহে।

সপ্তম অধ্যায়

বিবেকানন্দের উত্তর সাধক :
অরবিন্দ, গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র

বাংলার নবযুগ সম্পর্কে বিবেকানন্দের কথা প্রায় শেষ হইয়াছে, কেবল একটি কথা এখনও বাকি আছে। বিবেকানন্দের বাণীই যে পরবর্ত্তী মন্বন্তরের কোলাহলে ভারতের নিজস্ব সাধনাকে কিছু পরিমাণে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে সে বিষয়ে কিছু না বলিলেও চলিত ; কিন্তু এই জাতি এতই সত্য-ভীরু বা পাপ-দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন সাধনার ক্ষেত্রেও গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্বীকার করে না। বাঙালী ডুবিয়াছে, তাই বঙ্কিমচন্দ্রও ডুবিয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষ তো জাগিয়া উঠিতেছে ; সেই জাগরণের অন্তত দুইটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বাণী এখনও কার্য্যকরী হইয়া আছে। তথাপি বিবেকানন্দের প্রতিও সেই মনোভাবের কারণ কি ? মহাত্মা গান্ধীর পতিতোদ্ধার-ব্রত ও গণ-উদ্বোধন-নীতির মূলে বিবেকানন্দের সেই বাণীই যে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করিবে কে ?

বিবেকানন্দের 'কর্ম্ম'-মন্ত্র যেমন মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্র হইয়াছে, তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এ যুগের এক মহাশক্তিমান সাধকের সাধনার সহায় হইয়াছে,—শ্রীঅরবিন্দ যে সেই সাধন-মন্ত্রেরই উত্তর-সাধক, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই ; তাঁহার নিজেরই রচনাবলীতে ইহার স্পষ্ট আভাস আছে।

বিবেকানন্দের মত সন্ন্যাসী অথচ দেশ-প্রেমিক ভারুতবর্ষে পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং দেশে দেশে তাঁহার গুরুর নব জীবব্রহ্ম-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন; এক নব বেদান্তধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া দেশে-বিদেশে তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল। তিনি জ্ঞান-মার্গী সন্ন্যাসী হইয়াও এক নূতন কর্ম্ম-মন্ত্রের সাধক ছিলেন, এবং বহুকাল পরে এই ভারতবর্ষে বুদ্ধের আদর্শে এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা সকলেই জানে, কিন্তু তাঁহার সেই কর্ম্ম-জীবনের মূলে অধ্যাত্ম-পিপাসাকেও পরাভূত করিয়া কোন্ মানব-হৃদয়-বেদনা অনুক্ষণ জাগরুক ছিল, তাহা সেকালে কেহ বুঝিতে পারে নাই; আজ আর একজনকে দেখিয়া আমরা তাহা বুঝিয়াছি—বিবেকানন্দ-জীবনের জীবন্ত ভাষ্য-রূপে আজ আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখিতেছি। আগে স্বামীজীর কথাই বলি। স্বামীজীকে না বুঝিলে নেতাজীকে বুঝা যাইবে না; আবার নেতাজীকে না দেখিলে স্বামীজীর দর্শন লাভ হইবে না।

সেযুগে স্বামীজীর জীবনের সেই অপর দিক, তাঁহার সেই মহান্ হৃদয়ের অতি-নিরুদ্ধ বেদনা কেহ বুঝে নাই, তাঁহার সে পরিচয় কেহ ভাল করিয়া পায় নাই। তাহার কারণ, তাঁহার যুগ তখনও আগামী,—আসে নাই। কেবল একজন—যিনি গুরুর হৃদয় আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন—সেই পরম সৌভাগ্যবতী গুরুগত-প্রাণা, স্বামীজীর মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতা তাহা বুঝিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ মানবাত্মার মুক্তিকেও যেমন, তাহার বন্ধনকেও তেমনি আত্ম-গোচর করিয়াছিলেন। এজন্য সেই বন্ধন তাঁহার যেমন অসহ্য হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই। কোন্ দেশের কোন্ সমাজে

তিনি মানুষের চরম দুর্গতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ? পৃথিবীর আর সকল দেশে তিনি মানবাত্মার মহিমা ঘোষণা করিতেন, কিন্তু নিজের দেশে আসিয়া তিনি নির্ব্বাক হইয়া যাইতেন, অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইত। যেন ভারতের অভিশপ্ত দেহে ভারতেরই সেই গর্ব্বোদ্ধত আত্মা—সেই 'বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্'—আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিত, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী-ভারত যোগাসনে স্থির থাকিতে পারিত না! কিন্তু স্বামীজীর সে যাতনা রোদন-রবে উচ্ছ্বসিত হয় নাই, সেই অশ্রুকেও নিরুদ্ধ করিয়া, সেই বিষকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই মৃতকল্প জাতির শিয়রে জাগিয়া রহিলেন, এবং তাহার বক্ষে ও বাহুতে বলাধান করিবার জন্য, কর্ণে ক্রমাগত 'শিবোঽহম্ শিবোঽহম্' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্যাধির নিদান তিনি ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া তিনি তখনই কোন উগ্র ঔষধের ব্যবস্থা করেন নাই। একবার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারিলেই সকল উপসর্গ অন্তর্হিত হইবে, এখন তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিলে সকলই পণ্ড হইবে ; এ রোগের চিকিৎসায় বড় ধৈর্য্যের প্রয়োজন ; প্রাথমিক চিকিৎসাটাই আসল, সেইটি যদি ধরিয়া যায় তবে আর কোন ভাবনা নাই —রোগীর চেতনা হইবে, সে আপনি উঠিয়া বসিবে ; তখন সকল দুর্ব্বলতা ও উপসর্গ আবশ্যকমত অঙ্গচালনার দ্বারা সে নিজেই দূর করিতে পারিবে। ইহাই ছিল তাঁহার আত্মগত বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বজাতির সেই ব্যাধি-যন্ত্রণাও যেমন, তাহার হৃতস্বাস্থ্যকেও তেমনি, নিজ দেহ ও আত্মায় যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, এযুগে তৎপূর্ব্বে আর কেহ তেমন করে নাই—এই সত্য সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহার কারণও ছিল।

প্রথমতঃ তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী ; সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর যে প্রেম তাহার নাম কি দিব ? ভারতবর্ষে প্রেমকে ভগবৎ-প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শে শোধন করিয়া মানুষের মুক্তি-সাধনার অনুকূল করা হইয়াছে, কিন্তু সেই ব্যক্তিগত মুক্তি-সাধনাকে তুচ্ছ করিয়া এই যে মানব-প্রেম, এবং বিশেষ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম, ভারতবর্ষে ইহা নূতন ; আবার এই প্রেমও যে অধ্যাত্ম-পিপাসারই একটা রূপ, তাহা একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব। সন্ন্যাসী না হইলে, বৈরাগ্যের দ্বারা সুরক্ষিত না হইলে প্রেম এমন নির্ভীক ও বলীয়ান হইতে পারে না, প্রাণ এমন মুক্ত ও স্বাধীন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সেই কারণেই কোন সমাজ-বন্ধন না থাকায়, তিনি দেশের সকল সমাজে মিশিয়া, সকল প্রকার জীবন-যাত্রা আপন চক্ষে দেখিবার ও আপন মনে বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। দেশকে ভালবাসার মূলে ছিল—দেশের যাতনা-ক্লিষ্ট সর্ব্ব-অঙ্গের সহিত এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ঐ পরিচয়ের কাহিনী মহাকাব্য অপেক্ষাও রোমাঞ্চকর।

ঐ যে দুর্গত, আত্মভ্রষ্ট, মহাদুঃখী ভারতের জনসাধারণ উহাদের মধ্যেই তিনি মানব মহত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন—জীবের ভিতরে শিবকে দেখিয়াছিলেন। ইহাই দেখিবার জন্য তিনি পরিব্রাজক-বেশে ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান, শূদ্র ও অন্ত্যজ, গৃহী ও সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও মূর্খ, পতিত ও পুণ্যবান, সকলের মধ্যে তিনি সেই এক ভারতীয় ভাবের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া একটা বড় আশায় আশান্বিত হইয়াছিলেন।

দেশের দারুণ দুরবস্থাদর্শনে তাঁহার স্বকীয় অধ্যাত্ম-দৃষ্টি আরও নিঃসংশয় হইয়া উঠিল। জাতির উদ্ধারকল্পে, ভক্তি নয়—শক্তিকেই

তিনি একমাত্র সাধন-পন্থা বলিয়া দৃঢ়-নিশ্চয় করিলেন। তত্ত্ব বা সাধন-মার্গ হিসাবে ভক্তির মূল্য যেমনই হউক, উহা যে এযুগের ঐ সঙ্কটে শুধুই নিরর্থক নয়—বরং ক্ষতিকর, এবং শক্তিই যে একমাত্র সত্য-মন্ত্র, তাহা তিনি যে-দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং যেভাবে ও যেরূপে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি-বাদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার প্রতিভারই নিদর্শন। তিনি যে শক্তি-মন্ত্রের সাধক ও প্রচারক ছিলেন তাহাতে আত্মার জাগরণ আগে, পরে আর সব। তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিতেন যে, man-making বা মানুষ-গড়াই তাঁহার একমাত্র কাজ; তিনি আর কিছুই করিবেন না,—অন্ততঃ সেইকালে আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই।

স্বামীজীকে বিদেশীরা 'Warrior-Saint' আখ্যা দিয়াছে, তাঁহার চরিত্রে ক্ষত্রিয়-স্বভাবের প্রাধান্য ছিল—ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বামীজীও ঠিক যে কারণে দেশপ্রেমিক, নেতাজী সুভাষচন্দ্রও কি ঠিক তাহাই নহেন? নেতাজীর দেশ-প্রেমে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যে এক অপূর্ব্ব 'ভারতীয়তা'-বোধ আমরা দেখিয়াছি—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, স্বামীজীর সেই দেশপ্রেম-মন্ত্রই নেতাজীর সাধনায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।......

স্বামীজী ভারতীয় সমাজে নারীকে যে গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন—নেতাজীর মনোভাবও কি তাহাই নয়? স্বামীজী বলিতেন—

"With five hundred men the conquest of India might take fifty years, with as many women not more than a few weeks"

ইহার পর, নেতাজীর 'ঝান্সীর রাণী'-বাহিনী স্বামীজীর কীর্ত্তি বলিয়াই

মনে হয় না? আমি অবশ্য সেই মনোভাবের কথাই বলিতেছি। আর কত বলিব? নেতাজীর প্রেম, নেতাজীর ত্যাগ, নেতাজীর জ্বলন্ত আত্ম-বিশ্বাস—একদিকে অসুরের মত কর্ম্মশক্তি বা রাজসিক উদ্যমশীলতা, অপর দিকে যোগযুক্তের মত 'সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'—আত্মার সেই অবিক্ষুব্ধ প্রশান্তি; একদিকে অতি তীক্ষ্ণ বাস্তব-বোধ ও কার্য্যকুশলতা বা 'দক্ষতা' অপর দিকে কবির মত উচ্ছ্বাসপ্রবণ হৃদয়—এ-সকলই দুই চরিত্রের এক লক্ষণ।

নেতাজী যে এক অর্থে স্বামীজীর মানসপুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই; একজনের হৃদয়ে যাহা বীজরূপে ছিল আরেক জনের জীবনে তাহাই বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিতত্ত্বকেও গৌণ করিয়া যে সাক্ষাৎ-মুক্তি স্বামীজীর অন্তরে একটি প্রবল শক্তিরূপে বিরাজ করিত, নেতাজীও সেই মুক্তিকে অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন—দুই জনের প্রেমও সেই মুক্ত-প্রাণের পরার্থ-প্রীতি। স্বামীজীর যে হৃদয়—সঙ্কুচিত নয়—আপনাকে দমন করিয়া, যে-কামনাকে চরিতার্থ করিতে চায় নাই, সেই বিশাল হৃদযের নিপীড়িত কামনাই নেতাজীর মধ্যে অকুণ্ঠিত আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। স্বামীজী যদি গেরুয়া ত্যাগ করিতেন তবে সে আর কিছুর জন্য নয়—ঐ আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের 'নেতাজী' হইবার জন্য। সেই প্রেম তাঁহারও ছিল, কেবল সেজন্য জ্ঞানের তপস্যাকে সংবরণ করিয়া কিছুকাল প্রেমের সমাধিতে সংজ্ঞাহারা হইতে হইত। অতএব স্বামীজীর মধ্যে আমরা যেমন নেতাজীর ঐ প্রেমের মূল দেখিতে পাই, তেমনই নেতাজীর মধ্যে স্বামীজীর সেই বাণীকেই মূর্ত্তিমান হইতে দেখি—সেই একমন্ত্র—'Believe that you are free, and you will be.'

শত জাতি, শত সমাজ ও শত সম্প্রদায় সত্ত্বেও ভারতবর্ষের আত্মা

এবং সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের উপরেই বিবেকানন্দ এ যুগে এক নূতন মহাভারতের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন ; ঐ বাণীই তাঁহার বাণী ; উহাই জাতীয়তার মন্ত্র-বাণী। এই বাণীই নেতাজীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিকে সম্ভব করিয়াছে। স্বামীজীর সেই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি নেতাজীর বাস্তব-দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। তিনিও সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভেদ ঘুচাইয়া, স্বামীজীর সেই ধ্যানলব্ধ 'মহাভারত'কে সাকার করিয়া তুলিয়াছেন। স্বামীজীর অপর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কর্ম্মের প্রাথমিক প্রেরণাটি ধরাইয়া দেওয়া। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সেই প্রত্যক্ষ প্রয়োজনটি এমন করিয়া আর কেহ উপলব্ধি করে নাই। এ বস্তুটি তিনি ধ্যানে নয়—প্রাণে লাভ করিয়াছিলেন—কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী, নাম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তিনি সেই বিশাল জন-সমুদ্রে যেন আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

বিবেকানন্দ ও লোকমাতা নিবেদিতা

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নাম দিয়া যে একটি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার ঐ নামটাও যেমন, তেমনই তাহার অন্তর্গত ভাবটি আমাদের মধ্যে একটি সাহিত্যিক প্রবাদের মত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের ক্ষেত্রেও যেমন, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি, জাতির ইতিহাসে এমন অনেক 'উপেক্ষিতা' আছেন, যাঁহাদের নাম বিখ্যাতগণের আড়ালে পড়িয়া আমাদের স্মৃতিতে তেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার, তথা হিন্দু-ভারতের ইতিহাস যখন চিন্তা করি, তখন এমনই একজনের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ হয়, আবার ভুলিয়া যাই; আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সকলই স্মরণ করি, কীর্ত্তন করি—তাঁহাদের স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ ও স্মৃতি-কথা রচনা করিয়া এই নিত্য বিস্মৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতিভ্রংশ নিবারণ করি; কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া স্বামীজীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হইয়া আছে যে একটি অনন্য সাধারণ নারী-চরিত্রের মহিমা তাহাকে তেমন করিয়া আর স্মরণ করি না; এমন কি, যে মন্দিরের নবনির্ম্মিত চত্বরের একপ্রান্তে তিনি তাঁহার অন্তরের পূজা-প্রদীপ জ্বালাইয়া, নিজের সমগ্র দেহমন লুটাইয়া দুই করপুটে সেবার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছিলেন, মনে হয়, সেখানেও তাঁহার নামটি তেমন করিয়া কেহ স্মরণ করে না। এ যুগের বাঙালী-সন্তানকে সেই নিবেদিতার অপূর্ব্ব আত্মনিবেদনের কথা ভাল করিয়া স্মরণ করাইবার জন্য কোনরূপ স্মৃতি-পূজার আয়োজন হয় না, হইলেও বাহিরে তাহার তেমন প্রচার নাই!

জানি, তাহাতে সেই কল্যাণময়ী তপস্বিনীর—সেই সত্য-শিব-সুন্দর-নন্দিনীর জন্য কিছুমাত্র আক্ষেপের কারণ নাই, যে নিজেই "নিবেদিতা" তাঁহাকে নিবেদন করিবার ত' কিছুই নাই। আমাদের মত যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল, তাঁহার সেই পুণ্য জীবনের, সেই অতুল আত্মোৎসর্গের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়াছিল—এই জাতির দুর্গতি-মোচনের জন্য তাঁহার সেই সরব আকুলতা ও নীরব কর্ম্মযোগের কথা জানিত, তাহাদের হৃদয় দুর্ব্বল বলিয়াই ক্ষুব্ধ হয়, মনে হয়, এত স্মৃতি-উৎসব বারো মাসে চুরাশি পার্ব্বণের মত ছোট-বড়-মাঝারি কত জনের উদ্দেশে কত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে—কই, ভগিনী নিবেদিতাকে তাহার কোনটাতেই তেমন করিয়া আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি না! এ্যানি বেসাণ্টকে আমরা স্মরণ করি, নিবেদিতাকে করি না। সেকালের এক কবি লিখিয়াছিলেন—

"হৈমবতী উমার অর্ঘ্য কাড়বে ওলাই-চণ্ডী কি হায়?
বেসাণ্ট নেবে সে নৈবেদ্য অর্পিত যা' নিবেদিতায়!"

—ইহার কারণ কি? কারণ কি এই নয় যে, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমারা যে-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, সেই মন্ত্রই অন্যরূপ; তাহাতে সেই হৃদয়ের সাড়ার প্রয়োজন আর নাই, যাহাতে খাঁটি মনুষ্যধর্ম্মের প্রেরণা আছে, যাহাতে প্রাণের সত্যই আর সকল সত্যের উপরে।

নিবেদিতার পরিচয় আশা করি দিতে হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকথা যাঁহারাই অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহার এই আত্মসৃষ্ট কন্যাটির কথাও না জানিয়া পারিবেন না। বিবেকানন্দের চরিতকার মহামনীষী মঃ রোলাঁ বলিয়াছেন—

"The future will always write her name of initiation, Sister

Nivedita, to that of her beloved Master···as St. Clara to that of St. Francis."

গুরুর সহিত এই শিষ্যার যে সম্পর্ক—অধ্যাত্ম-জীবনের সেই এক অভিনব আত্মীয়তার তত্ত্ব পরে কিছু আলোচনা করিব, তেমন আত্ম-নিবেদন-কাহিনী আমাদের কোন ভক্তমাল-গ্রন্থে কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি কেমন করিয়া এই গুরুলাভ করিয়াছিলেন, তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিজেই তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে (The Master as I saw Him) লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় গুরুবাদের একটা নূতন ভাষ্যও তাঁহার ঐ গুরু-পরিচয়-গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। সে যেন একটি শাণিত খড়গ—যেমন দিব্য প্রভাসমুজ্জ্বল, তেমনই নির্ম্মম ; সেই খড়েগর নীচে নিবেদিতা তাঁহার আত্মাভিমানী দেহটাকে—তাঁহার যত কিছু পূর্ব্ব সংস্কার, এবং প্রাণ ও মনের যত কিছু কামনাকে—বলি-স্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহাকে ভারতের হিতার্থে উৎসর্গ করিবার কালে বলিয়াছিলেন—"যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক ; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমা-শক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।"

ইহার পর নিবেদিতার যে জীবন আরম্ভ হইল, তাহা এমনই সেবা ও আত্মদান-মূলক তপস্যার জীবন যে, বাহিরের শোভাযাত্রায়, ধ্বজ-পতাকায় তাহার জয়-ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে অগ্নি তিনি আপন হৃদয়-পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন. তাহার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবক শিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করিয়া, তিনি

কেবল তাহার আলোকটুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার কর্ম্মযোগ, গুরু-নির্দ্ধারিত তাঁহার সেই ব্রত ও তাহার উদ্‌যাপন-পদ্ধতির কথা এখানে বলিব না, আমি তাহার উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিচারের অধিকারী নই। বাংলার মাটিতে হলকর্ষণের পর, যখন নবজীবনের বীজ বপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল; তাহারই মধ্যে এই আর একটি বীজ যেন সকলের দূরে, এক কোণে—নিজেকেই ফলে-পুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়—অপর গুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্য্যন্ত পৌঁছায় না; সে কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে; সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসন্তী শোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার এই নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন্ রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল,—তাহা নির্ণয় করিবে কে?

এমন কত মহাজীবনের মহান্ আত্মোৎসর্গ যুগে যুগে সকল জাতির সাধনাকে সম্বর্দ্ধিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছে। ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না, সন্ধান চায়ও না; তাহার কারণ, ইতিহাসের লক্ষ্যই অন্যরূপ। যাহারা ইতিহাসকে গড়িয়া তোলে তাহাদের পরিচয় করা সহজ; যাহারা সেই গড়ার উপাদান হইয়া বা সেই গঠন-শিল্পীর যন্ত্র হইয়া, শিল্পীর কীর্ত্তিকে সম্ভব করিয়া তোলে, তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। যে গড়ে তাহার একরূপ আত্মাভিমান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই যাহাকে সেই গঠনের উপাদান, উপকরণ, বা যন্ত্র হইতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিমান না থাকাই আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ সেই গঠন-শিল্পী; ভগিনী নিবেদিতা আপনাকে তাঁহার হাতে যন্ত্রস্বরূপ সমর্পণ করিয়াছিলেন—একজনকে

যেমন দুর্দ্ধর্ষ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে হইয়াছিল, অপরকে তেমনি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করিতে হইয়াছিল।

সেই আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গুরুর নিকটে শিষ্যের আত্মনিবেদন একটা অসামান্য কিছু ত নয়ই, বরং অতিশয় সাধারণ। ভক্তির অর্থ তাহাই। কিন্তু সাধারণ ভাবে, যে সকল কারণে, এইরূপ আত্মবিলোপ দুঃসাধ্য নয়—নিবেদিতার পক্ষে তাহার বিপরীতগুলিই প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন, এবং বয়োধর্ম্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাব-জীবনে নয়—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়া প্রায় অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হইবে। ধর্ম্মান্তরিত হওয়ার জন্য যে আচার-অনুষ্ঠানগত পরিবর্ত্তন মানুষের জীবনে হইয়া থাকে, তাহার শতসহস্র দৃষ্টান্ত আছে; কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর-গ্রহণ যে সম্ভব তাহা ভগিনী নিবেদিতাকে না দেখিলে কেহ কখনও বিশ্বাস করিত না। এই একটা দিক দিয়াও তাঁহার জীবন অনন্যসাধারণ—এমন বোধ হয়, আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন জাতিটাই বদলাইয়া গিয়াছে, তাঁহার রক্তেও যেন বাঙালী-হিন্দুর জন্ম-জন্মান্তরগত সংস্কৃতির অবচেতন ভাবধারা পূর্ণ প্রবাহিত হইয়াছে! ভারতের সেবায় এই শিষ্যাকে উৎসর্গীকৃত করিবার সময়ে গুরু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে তোমার পূর্ব্ব জীবন; পূর্ব্ব সংস্কার, পূর্ব্ব অভ্যাসের স্মৃতি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিতে হইবে, দেহের ও প্রাণের প্রতি তন্তুতে অনুভব করিতে হইবে যে, তুমি এই দেশের সন্তান, এই জাতিই তোমার জাতি।" গুরুর ঐ বাক্য এমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া? এ কোন্

ধাতু শক্তির খেলা! নিবেদিতার বয়স তখন আটাশ বৎসর—তিনি য়ুরোপীয় ভাব-চিন্তা, দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছেন—আশ্চর্য্য ধীশক্তি ছিল তাঁহার; সেই ধীশক্তি, চরিত্রবল ও স্বাধীনচিন্তা এবং অধ্যয়নশীলতার বলে তিনি তৎপূর্ব্বেই একটা তত্ত্ব ও তাহার সাধনপন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব জন্মান্তর-গ্রহণের রহস্যভেদ করিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার গুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। সে কথাও পরে।

এই দেশ, এই জাতি ও এই সমাজে নিজেকে এমন করিয়া বিলাইয়া দেওয়া ত' কেবল ইচ্ছা ও সংকল্পমাত্রেই—সে যত দৃঢ় হউক—একতরফা সম্পন্ন হইতে পারে না। বাঙালী হিন্দু-সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তিনি তাহার উঠানে একপাশে একটা স্থান করিয়া লইয়াছিলেন; তজ্জন্য নিজেকে কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে করিতেন না; সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ না করিলেও তিনি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধিক কিছু না বলিয়া আমি এখানে কেবল একটি ঘটনা—সহস্রের একটি—উল্লেখ করিব। বাগবাজারে তাঁহার যে স্কুলটি ছিল, তাহাতে বালিকা, কিশোরী, কুমারী ও বিধবা—নানাবর্ণের কন্যারা শিক্ষালাভ করিত। ভগিনী তাহাদিগকে সেকালের প্রথা অনুযায়ী একখানি ঢাকা-গাড়ীতে করিয়া নানা দর্শনীয় স্থানে শিক্ষার্থে লইয়া যাইতেন। একবার তিনি কয়েকজনকে কলিকাতার যাদুঘর দেখাইতে লইয়া যান। প্রকাণ্ড বাড়ীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিবার পর কন্যাগুলি একটু শ্রান্ত ও পরে পিপাসার্ত্ত হওয়ায়, তিনি তাহাদিগকে জলের কলটির নিকটে লইয়া গিয়া নিজের বসন-মধ্য হইতে একটি গেলাস বাহির করিলেন—গেলাসটি তিনি যাত্রাকালেই সকলের অগোচরে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এক্ষণে গেলাসটি

ধুইয়া স্বহস্তে জলপূর্ণ করিয়া মেয়েদের ডাকিয়া পান করিতে বলিলেন। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কয়েকটি বয়স্কা কন্যাও ছিল,— তাহারা ঐ জল গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন একজন— বোধ হয়, ততখানি জাত্যভিমানের কারণ তাহার ছিল না —অগ্রসর হইয়া সেই গেলাস তাঁহার হাত হইতে লইয়া, অসঙ্কোচে সেই জল পান করিল। ভগিনী নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে গেলাসটি লইয়া নিজে তাহা ধৌত করিয়া, শূন্য গেলাসটি মাটিতে রাখিয়াদিলেন এবং প্রত্যেককে পর পর আপন হাতে তাহা ভরিয়া পান করিতে বলিলেন। মুখে এতটুকু ব্যথার বা অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নাই; সে মুখ তেমনই স্নেহোদ্ভাসিত, তেমনই প্রসন্ন ও প্রীতি পূর্ণ। এই জাতি ও এই সমাজের সেবা ও কল্যাণ-কামনায় ভগিনী নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ যে কিরূপ ছিল, তাহা উপরের ঐ একটি কাহিনী হইতে যিনি বুঝিয়া লইতে না পারিবেন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এ প্রসঙ্গ আরও দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই।

এইবার আমি ভগিনী নিবেদিতার কিছু পরিচয় সেকালের সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত করিব। তাঁহার উদ্দেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

"প্রসূতি না হ'য়ে কোলে পেয়েছিল পুত্র যশোমতী,
তেমনি তোমারে পেয়ে হৃষ্ট হয়েছিল বঙ্গ অতি—
বিদেশিনী নিবেদিতা!…"

…ঐ একটি উপমা ব্যতীত আর কোন যথার্থ উপমা কবির মনেও উদয় হয় নাই। নিবেদিতার মৃত্যু সংবাদে সত্যেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি সদ্য রচনা করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙে হিমালয়ের কোলে অতিশয় অকালে তিনি দেহত্যাগ করেন, তাই কবিতার এই শেষ চারিটি পংক্তিও সত্যভাষণে যথার্থ হইয়াছে—

"এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিযা গেলে, হায়,
চ'লে গেলে অল্প আয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়
দেহ রাখি' শৈলমূলে—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী!
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী!"

এইবার নিবেদিতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে একটি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কোন কোন সভায় যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। পরে এই প্রবন্ধে, নিবেদিতার সহিত তাঁহার সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার কারণ বিশেষরূপেই অবগত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"নিজেকে এমন করিযা সম্পূর্ণ নিবেদন করিযা দিবার আশ্চর্য্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোন প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা, এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ কবিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্ব্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব—কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।"

* * * *

"বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্ত্তি ত ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখি নাই! এ সম্বন্ধে যে কর্ত্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন 'our people', তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি ত লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে, সে

নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয় ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।"

* * * *

"কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন ; কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্য লোকের অসঙ্গত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন, কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল, পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপ্‌ল্"-দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন, তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধা দৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন।"

* * * *

"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্দ্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেক দিন অর্দ্ধাশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই ; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ

ছিল না ; মানুষের-মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামিরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে ?"

এইবার আমরা এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের—এই পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের রহস্য সন্ধান করিব। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতার সেই আত্মবিলোপ-কাহিনী যেমন বর্ণিত হইয়াছে, তেমন করিয়া বর্ণনা আর কেহ করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগিনীর প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধা একান্ত তাঁহারই প্রতি ; রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া ভগিনী নিবেদিতার অর্চ্চনা করিয়াছেন। এই অর্চ্চনায় একটা ফাঁক আছে, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে নিবেদিতার গুরুকে একবারও স্মরণ করেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ গুরুবাদকেই চিরজীবন অস্বীকার করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, নিবেদিতার জীবনে ঐ গুরুবাদ কোন্ অর্থে সত্য—গুরুবাদের তত্ত্বটাই ভ্রান্ত কিনা, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন ; কারণ, নিবেদিতার ঐ নামটাও যেমন গুরুদত্ত, তেমনই তাঁহার সেই সমগ্র নিবেদিতা-জীবনই নিরবচ্ছিন্ন গুরুমন্ত্রের সাধনা ; তাঁহার সেই আত্মবিলোপও গুরুতেই আত্মবিলোপ ! ইহার প্রমাণ নিতান্তই অনাবশ্যক। তাঁহার ভিতরে যে সত্য ছিল, যে অসমান্য ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি ছিল—যাহা রবীন্দ্রনাথকেও বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছে, সেই শক্তি এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহার গুরুই পারিয়াছিলেন, গুরুবাদের যদি কোন অর্থ থাকে তবে তাহা ইহাই। ভিতরে সেই বস্তু থাকা চাই ; কিন্তু এক-একটি ক্ষণে মানুষের জীবনে এক একটি দর্শন-লাভ হয় ; বাহিরে ব্যক্তির

রূপেও হয়, আবার অন্তরের একটা দিব্য উপলব্ধির (Revelation) মতও হয়, যাহাতে মানুষ যেন দ্বিজত্ব লাভ করে। যাহার প্রকৃতি এবং প্রয়োজন যেমন, তাহার সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বাহিরের কোন অসাধারণ ব্যক্তি-পুরুষের সংস্পর্শেই অধিকাংশ ভাগ্যবান নর বা নারীর জীবনে আশ্চর্য্য রূপান্তর হইয়াছে তাহা আমরা জানি। আমাদের শাস্ত্রেও তাই শুধুই 'মনুষ্যত্ব' অর্থাৎ মনুষ্য-জন্ম, এবং 'মুমুক্ষুত্ব' অর্থাৎ পরমের পিপাসাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তাহার সঙ্গে 'মহাপুরুষ-সংশ্রয়' অত্যাবশ্যক বলা হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতার জীবন-কাহিনী যিনি সম্পূর্ণ জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী জীবন তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার কেবল ঐ মহাপুরুষের সংশ্রয়টাই যেন বাকি ছিল, যেমন তাহা ঘটিল, অমনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের খোলসটি বিদীর্ণ করিয়া আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। সেই লগ্নের সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন বেগ তাঁহাকে কিরূপ বিহ্বল করিয়াছিল—তাহাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। যে-মুহূর্ত্তে সর্ব্ব ত্যাগ—সেই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বপ্রাপ্তি! সে প্রাপ্তি যে কেমন তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি—সেই প্রাপ্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতেই ভগিনীর সেই অফুরন্ত দান। তেমন করিয়া না পাইলে, এমন করিয়া দান করিতে কেহ পারে না। কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন কোথায়, কাহার নিকটে ?

সে কথা তিনিও বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। স্বামীজীর নিকটে তিনি কি পাইয়াছিলেন এবং স্বামীজীর তাঁহার কি ছিলেন, তাহাই বলিবার জন্য তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; সেই গ্রন্থ (The Master as I saw Him) জগৎ-সাহিত্যে মানবাত্মার এক অপূর্ব্ব

আত্ম-কাহিনী হিসাবে অমর হইয়া থাকিবে। এই কাহিনীতে এবং অন্যত্র গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে একটি আত্মিক সম্পর্ক ফুটিয়া উঠিতে দেখি—আমাদের জ্ঞানে তাহার কোন নাম-নির্দ্দেশ করিতে পারি না। গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক আমাদের দেশে নূতন নয়; সেই সম্পর্কের গত প্রকার-ভেদ আছে—সাধন মার্গ, অধিকার এবং শিষ্যের ব্যক্তিগত বিশিষ্ট চরিত্র অনুসারে, তাহাতে যে বৈচিত্র্য ঘটে তাহাও কিছু কিছু বুঝিতে পারি: কিন্তু স্বামীজীর সহিত ভগিনী নিবেদিতার ঐ সম্পর্ক এমনই অপূর্ব্ব যে তাহা চিন্তা করিলে দেহধারী আত্মার অনন্ত লীলা একটা নূতন রসরূপে আমাদের হৃদয়-গোচর হয়। একদিকে স্বামীজীর সেই দৃপ্ত পৌরুষ—যে-পৌরুষ সকল মমতা, সকল দুর্ব্বলতাকে নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, আর একদিকে তেমনই তেজস্বিনী নারী—সে তেজও যজ্ঞ-বেদীর হোমানল শিখার মত। স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রজ্বলন্ত পৌরুষই যে তেজস্বিনী নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই—ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রে এই তেজ যে কি পরিমাণ ছিল, তাহা অন্তরঙ্গগণ সকলেই জানিতেন। রবীন্দ্রনাথও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এমনও বলিয়াছেন যে, এই তেজ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি লিখিয়াছেন—

"…নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দ্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারো প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত"।

এই যে তেজ, চিত্তের এই দুর্দ্দমনীয়তা ইহাই ছিল তাঁহার জন্মগত, প্রকৃতিগত সম্পদ; ইহাই ছিল তাঁহার নিজ আত্মার মূলধন। গুরু বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বলে, এই বস্তুটিকে তাঁহার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং ইহা যে হোমাগ্নির মতই পবিত্র তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই ইহা ত' কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিবে না। যুবক নরেন্দ্রের মধ্যেও ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঠিক এই বস্তুই দেখিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রও ঠিক সেই কারণে বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে নাই। অতএব গুরু ও শিষ্যের প্রথম দর্শনে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল—উভয় ক্ষেত্রে তাহা প্রায় এক। শেষে নরেন্দ্র যেমন বলিয়াছিলেন—"আমাকে জয় করিয়াছিল তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) সেই অদ্ভুত প্রেম," ভগিনী নিবেদিতাও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সেই দুর্দ্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম যে কিরূপ ছিল তাহা আমি পূর্ব্বেই সবিস্তারে বলিয়াছি—পর্ব্বতের মত অটল, এবং পাষাণের মত কঠিন সেই পুরুষের অন্তরে যে প্রেমের সুধানিস্যন্দিনী নিত্য প্রবাহিত ছিল তাহা সকলের বোধগম্য হইত না। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন—তেমন করিয়া বোধ হয় আর কেহ করে নাই; কারণ সে প্রেম এমনই যে, তাহাকে অনুভব করিতে হইলে, অগ্নি শিখায় দেহ সমর্পণ করিয়া তাহার জ্বালা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর প্রতি যে প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার মূলে যদি নারীপ্রকৃতি-সুলভ কোন আকূতি মর্ম্মান্তিকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, গুরু বিবেকানন্দ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন; নিবেদিতা নিজেরই পুণ্য বলে তাঁহার গুরুর সেই ব্যক্তি-সম্পর্কহীন মহাপ্রেমের (যে প্রেমের আমরা ধারণাই করিতে পারি না) অপূর্ব্ব রস

আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। আমারা জানি, স্বামীজীর পুরুষ-আত্মা প্রকৃতির বশ্যতা আদৌ স্বীকার করে নাই; মায়াকে একেবারে উড়াইয়া না দিলেও তাহাকে জয় করিয়া, বশ করিয়া, তিনি সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকেই কল্যাণী মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে নারী-প্রকৃতি ছিল, তাহাকেও তিনি কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরম স্নেহে তাহাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই যে স্নেহ—ভগিনী নিবেদিতা তাহাতেই তাঁহার নারী-হৃদয়ের গভীরতম পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মঃ রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন—

"But her love was so deep that Nivedita does not seem to have kept any memory of the harshness from which she suffered to the point of the great dejection. She only kept the memory of his sweetness. Miss Macleod tells us :

I said to Nivedita : 'He was all energy.' She replied : He was all tenderness.' But replied : 'I never feel it. 'That was because it was not shown to you. For he was to each person according to the nature of that person and his way to the Divine."

সর্ব্বত্যাগিনী তপস্বিনী নারী গুরুর চরণ-মূলে কেবলমাত্র সেইটুকুর আশ্বাসে নিজের জীবনটাকে পুষ্পাঞ্জলির মত নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি গুরুর সাক্ষাৎ সাহচর্য্য বা সঙ্গ খুব অল্পই পাইয়াছিলেন—তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনের পর মাত্র চারি বৎসর স্বামীজী বাঁচিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একবার কয়েক মাসের জন্য অপর কয়েকজন গুরুভগ্নীর সঙ্গে, কাশ্মীর ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তিনি স্বামীজীর কিঞ্চিৎ নিকটে অবস্থান করিতে

পাইয়াছিলেন। গুরুর নিকটে থাকিবার কোন সুযোগই ছিল না; প্রথম কিছুদিন স্বামীজী তাঁহার এই শিষ্যার প্রতি এমন অতিরিক্ত কঠোর ছিলেন যে, নিবেদিতার সে ছিল একরূপ অগ্নিপরীক্ষা; শুনা যায়, সেই কঠোরতায় তিনি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর তিনি প্রাণে যে কি বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মত মানুষের পক্ষে ধারণা করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা মাত্র, আমি চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই। আমার মনে হইয়াছে, সেই প্রেম মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়—প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাকে অশুচি করা হইবে। বোধ হয়, তাহা জগতে একটি মাত্র কবির কাব্যকল্পনায় কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি লাভ-করিয়াছে; সেখানে দেহ ও মনের সমস্ত মলিনতামুক্ত হইয়া, অথচ মানব-হৃদয়ের আকুল রোদনরবে বন্দিত হইযা, সেই প্রেম অতি উর্দ্ধলোক হইতেও আমাদের চক্ষে দীপ্তি দান করে। বিয়াত্রিচের প্রতি মহাকবি দান্তের সেই যে প্রেম, তাহার নাম কি? তাহা ভগবদ্ভক্তির নীচে, না উপরে, না একই পদবীর? সেখানে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় অনুরূপ বটে, কিন্তু ঐরূপ প্রেমে কি নারী পুরুষ-ভেদ আছে? বৈষ্ণব বলিবেন, আছে, কারণ, প্রেমের আশ্রয় মাত্রেই নারীজাতীয়; তাহা হইলে দান্তেও সেখানে পুরুষ নহেন—নারী। আমি ভগিনী নিবেদিতার এই গুরুভক্তির মধ্যেই নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক মমতা কোন্ রূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহার একটা অক্ষম অসম্পূর্ণ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি: মানুষের ভাষায় তাহার অধিক অসম্ভব! আবার, আমার মত মানুষের সাধ্য কি যে, তাঁহার মত মহীয়সী নারীর তপোবীর্য্য-মহৎ সেই অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ লাভ করি! তথাপি সেই প্রেমের যে দিকটি একান্ত ব্যক্তিগত, সে দিকটি—অপর কেহ দূরে থাক,—গুরুকেও তিনি

দেখিতে দেন নাই, সে অধিকার গুরুরও ছিল না। তাঁহার সম্পর্কে তিনি শেষ পর্য্যন্ত কি কঠিন মৌন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার গ্রন্থে (My Master as I saw Him) তিনি গুরুর শেষ-জীবনের শেষ দিন কয়টির কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; সর্ব্বশেষে স্বামীজীর তিরোধান-কথাও লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই দিনের সেই ঘটনা একটি সংক্ষিপ্ত ও যথার্থ বিবৃতি ছাড়া এমন একটি কথাও তাহাতে নাই, যাহাতে তাঁহার নিজ প্রাণের এতটুকু হাহাকারও শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করার পর পাঠকমাত্রেই ঐখানে পৌছিয়া যতটুকু উদ্বেল না হইয়া পারে না, এবং সেই জন্য যে সহানুভূতি আকাঙ্ক্ষা করে, লেখিকা তাহাতেও বিমুখ। আমারও রীতিমত আশা ভঙ্গ হইয়াছিল! তারপর যখন স্বামীজীর পৃথক জীবন-কাহিনীতে তাঁহার সেই তিরোধানের বিস্তৃত বিবরণ-প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার একটি আচরণের কথা অবগত হইলাম, তখন নিজের বিমূঢ়তাকেই ধিক্কার দিলাম। মৃত্যুর পরদিন বেলা ১টা-২টা পর্য্যন্ত স্বামীজীর শবদেহ একটি কক্ষে শয্যার উপরে সযত্নে শায়িত করিয়া রাখা হইয়াছিল ; নিকটে ও দূরে তাঁহার সেই আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদ প্রেরিত হওয়ায়, এবং অন্ত্যেষ্টিকালে সকলের উপস্থিতির যথাসম্ভব সুযোগ দিবার জন্যই এইরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতাও সংবাদ পাইলেন তাঁহার পক্ষে সে কেমন সংবাদ ? কে তাহা বুঝিবে ? বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি ? পরে কেবল ইহাই দেখি যে, স্বামীজীর সেই শবদেহের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া একখানি পাখা হাতে লইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। সে মূর্ত্তি ধীর-স্থির, একেবারে নিস্তরঙ্গ ; চক্ষে অশ্রু নাই, অধরোষ্ঠও একটু কাঁপিতেছে না। তিনি কেবল একমনে গুরুর দেহে ব্যজনী

সঞ্চালন করিতেছেন! তখনও সেই সেবার অধিকারটি ত্যাগ করিবেন না। বুদ্ধের পরম স্নেহাস্পদ ও নিত্যসহচর আনন্দের কথা মনে পড়িল। তিনিও তাঁহার গুরুর মহাপরিনির্ব্বাণ সময়ে শোকাভিভূত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, সেই পুরুষ অপেক্ষা এই নারীর প্রকৃতি আরও কঠিন, এ ধাতু অগ্নিতেও গলে না। তাঁহার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা কল্পনা করিতে পারে কোন্ কবি, কোন্ সাধক, তাহা আমি জানি না।

* * *

উপরে আমি যে প্রসঙ্গ একটু সবিস্তারে করিয়াছি, তাহার প্রয়োজন ছিল। ভগিনী নিবেদিতার এই যে আত্মোৎসর্গ—এই জাতিকে তিনি যে এমন চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাকে এমন করিয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহার কারণ সন্ধান করিতে হইলে, কেবল ব্যক্তির ব্যক্তিগত চরিত্র বা প্রকৃতির মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে না। পদ্মফুল খুব বড় ফুলই বটে, তথাপি সূর্য্যের আলোক ব্যতিরেকে তাহা প্রস্ফুটিত হয় না। ভগিনী নিবেদিতা এই দেশকে যে এত ভালবাসিয়াছিলেন, এমন করিয়া তাঁহার জীবনটাকে তাহার সেবায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আদৌ সেই গুরুরই প্রীত্যর্থে। তাঁহার গুরু যাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, তিনিও তাহাকে ভাল না বাসিবেন কেমন করিয়া? স্বামীজী যে দৃষ্টিতে তাঁহার দেশকে দেখিয়াছিলেন, শিষ্য নিবেদিতার চক্ষে সেই দৃষ্টি তিনি পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের হৃদয়খানিকেই এই শিষ্যার বক্ষগহ্বরে যেন বসাইয়া দিয়াছিলেন। নতুবা, এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিত না। গুরুর সহিত একাত্ম হইয়া, সেই গুরুর হৃদয়ে আপনার হৃদয় নিঃশেষে গলাইয়া মিলাইয়া দিয়া, তিনি যে

সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে এই দেশের এবং তাঁহার গুরুর সেবা। এমনই হয়; জগতের ইতিহাসে নর-নারীর যত মহাবস্তুরদান-কাহিনী আছে—প্রেমই তাহার একমাত্র প্রেরণা। ঐ প্রেমের তত্ত্বই একমাত্র তত্ত্ব—আর সকলই জগতের পক্ষে মিথ্যা। সেই প্রেমকে আমরা একটা সাধারণ বস্তুরূপেই জানি, কখনও বা সেই সাধারণ বস্তুর একটা বিশেষ রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হই; কিন্তু তাহার পরম রূপ—সেই অপর রূপ—আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কারের অতীত; ভগবদ্ প্রেমই বল, আর গুরুভক্তিই বল, কোন নামেই তাহাকে বিশেষিত করা যায় না। নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য—এ সকল সম্পর্ক আমাদের সংস্কারের পোষকমাত্র; প্রেম এক রূপ, তাহার দুই রূপ নাই। যাহার অন্তরে এই প্রেম নাই, সেই ব্যক্তি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমা কীর্ত্তন করে, তাই গুরুবাদ তাহার নিকটে আর কিছুই নয়—সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অবমাননা। আসলে গুরু যে আর কিছুই নয়—বৃহতের বেদীমূলে মানুষের ক্ষুদ্র অহংকে বলি দিবার যজ্ঞ-যূপ, প্রেমের অমৃতপানে আত্মাকে আনন্দ-স্বরূপে অধিষ্ঠিত করিবার পানপাত্র, এবং তাহারই প্রয়োজনে অদ্বৈতের একরূপ দ্বৈতবিলাস ইহা যাঁহারা মানেন না, তাঁহারা মানবতার ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যতদিন মানুষ মানুষমাত্র, ততদিন ঐ হীনযান অপেক্ষা এই মহাযানই তাহার প্রশস্ততর পন্থা হইয়া থাকিবে, এবং "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" নয়—ভগিনী নিবেদিতার ঐ জীবন এবং তাঁহার ঐ অপূর্ব্ব সাধনাই মানুষকে সেই আশ্বাসে চিরদিন আশ্বস্ত করিবে।

নবম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানবত্বের কথা—তাঁহার মানব-প্রেমের কথা ভাবিতেছিলাম। এই প্রেম জগতে অনেকবার শরীরী হইয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু এবার তাহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। বুদ্ধ জগতের প্রথম প্রেমিক; জীবদুঃখে কাতর হইয়া তিনি এই দুঃখের নিদান ও তাহার আত্যন্তিক উচ্ছেদের যে উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই জন্ম-জরা-মৃত্যুর সংসারকে অসার বুঝিয়া আত্মারও উচ্ছেদ-সাধন পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; তাঁহার মতে সৃষ্টি শুধু যে 'মিথ্যা-ভূতা' তাহা নয়, তাহা 'সনাতনী'ও নয়—দ্বৈত অদ্বৈতের কোনটাই তত্ত্ব নয়; আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সকল সংস্কারের নির্ব্বাণ-সাধনাই একমাত্র পন্থা। বুদ্ধ যত বড় প্রেমিক, তত বড় সন্ন্যাসী। এই বাণী মানুষের অহঙ্কার-নাশে সহায়তা করিয়াছিল, এবং ইহারই প্রেরণায় জীবনের মহত্তর আদর্শ, মনুষ্যত্বের বৃহত্তর আশ্বাস, একদা ভারতীয় সমাজে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু আত্মা মরে নাই, বরং এই উন্মাদনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে আত্মা ও অনাত্মার দেহতত্ত্বকে আরও কঠিন ভাবে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অনাত্মার উপরে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর ভারতের বাহিরে জগতের দ্বিতীয় প্রেমিক খ্রীস্ট, এবং ভারতের ভিতরে কোনও মহাপুরুষ, ভাগবত প্রেম-ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিলেন। শঙ্করের অদ্বৈত-আত্ম-তত্ত্বের আস্তিকতা বৌদ্ধ শূন্যবাদ নিরসন করিলেও, মানুষের প্রাণ সেই উত্তুঙ্গ তুষারশিখর-বিচ্ছুরিত শীতল জ্যোতির আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতে

পারে নাই। এই ভাগবত ধর্ম্মেরই নানা মন্ত্র মানুষের দুঃখ-নিবৃত্তির সাধনোপায় হইয়াছিল। তথাপি একদিকে জ্ঞান ও অপর দিকে প্রেম, এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব চিরকাল মানুষের অধ্যাত্মচেতনায় জাগিয়া রহিল। মাত্র একবার ভারতীয় হিন্দু-প্রতিভার উৎকৃষ্ট-নিদর্শন-স্বরূপ গীতোক্ত কর্ম্ম-সন্ন্যাসবাদে এই দ্বন্দ্ব সমাধানের এক অপূর্ব্ব পন্থা উঁকি দিয়াছিল—বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্মনীতির এক নূতন অর্থবাদ হইতেই এই কর্ম্মসন্ন্যাস-মন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু তথাপি সমস্যার মূল যেন দৃষ্টির বাহিরেই রহিয়া গেল। খ্রীষ্টের ভক্তি-ধর্ম্ম, বৈষ্ণবের জ্ঞানভক্তিবাদ—দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত—কিছুতেই মানুষের মনুষ্যত্ব-বোধ পরিতৃপ্ত হয় নাই; যুগবিশেষের যুগধর্ম্মরূপে এই সকল উপদেশ যতই কার্য্যকরী হউক, যুগান্তরের ক্রমবর্দ্ধমান মানবীয় চৈতন্যে যে আধ্যাত্মিক সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, মানুষের দেহমন যে তীব্রতর চেতনায় অশান্ত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে খ্রীষ্টের—"Render unto Caesar what is Caesar's due."—এই নীতি অনুযায়ী সংসারের সঙ্গে তেমন সহজ বোঝাপড়া আর সম্ভব নহে। আধ্যাত্মিক সঙ্কট অপেক্ষা আধিভৌতিক সঙ্কটই এখন মানুষকে এমন কোণঠেসা করিয়াছে যে, ইহকালই তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে; অথচ তাহাতেও বাঁচিবার আশা নাই। আজ যে ভগবৎমুখী হইয়া বসিয়া থাকে, সে হয় ক্লীব, নয় অন্ধ। মধ্যযুগের আদর্শ আজ অচল। অথচ ধর্ম্মহীন হইলে মানুষ বাঁচিবে না। তবে উপায়?

উপায় সর্ব্বযুগে যাহা ছিল এই যুগেও তাহাই,—মানুষের বাঁচিতে হইলে জীবনেরই আরাধনা করিতে হইবে,—বৃহত্তর জীবনের। এক কথায়, প্রেমই সেই সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী। যুগে যুগে ইহাই মানুষকে

বাঁচাইয়াছে ; আত্মোৎসর্গ না করিয়া আত্মলাভ নাই। কিন্তু এ যুগে সে প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে? প্রেমের নূতনতর ভিত্তিভূমি কি হইবে? ভগবানে আত্মসমর্পণ যে প্রেমের আদর্শ, সে প্রেমে আজ কেহ সাড়া দিবে না—আজিকার মানুষ অহৈতুকী প্রেমেরও হেতু জিজ্ঞাসা করে। খৃষ্টান বা বৈষ্ণব—কোন theology-তেই সে বিশ্বাস করে না; কোন তত্ত্ববাদ তাহাকে প্রেমিক করিয়া তুলিবে না। অথচ তাহাকে বাঁচিতে হইবে—মানুষের একমাত্র ধর্ম্ম যে প্রেম, তাহার দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীময় মানবের নবজাগরণ হইয়াছিল—প্রাচীন সংস্কার জীর্ণ-নির্ম্মোকের মত মানুষের মন হইতে খসিয়া পড়িতেছিল। এক নূতন বুভুক্ষা এই নবজাগ্রত মানব সমাজকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। এ বুভুক্ষার মূলে ছিল মানুষের অতি তীব্র মনুষ্যত্ব-চেতনা। এই বুভুক্ষা প্রশমনকল্পে কত মনীষীর মনীষা ব্যর্থ হইল—কত পথ্যের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু পাক-প্রণালী আবিষ্কৃত হইল না। সমাজে ও রাষ্ট্রে কত ভাঙ্গাগড়া, সমাজনীতি ও রাজনীতির কত নিত্য নূতন মতবাদ, শাস্ত্র ও গুরুবাদের পরিবর্ত্তে বিবেক ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বজা, নব ধর্ম্ম-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—এই ক্ষুধার কত লক্ষণই কত দিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল; মানুষ যেন কস্তুরী-মৃগের মত নিজ নাভি-গন্ধে দিশাহারা হইয়াছিল। যে ধর্ম্ম এতকাল সমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহা আর যথেষ্ট নয়—তাহার উপর যে জোড়াতালি চলিতেছিল তাহাতে এই ক্ষুধা আরও বিকৃত হইয়া পড়িতেছিল; মনুষ্যত্বের নামে ব্যক্তির আত্মপরায়ণতা প্রশ্রয় পাইয়া মহাবিনাশের পথ প্রস্তুত করিতেছিল।

এমনই কালে এই বাংলা দেশের জল মাটিতেই প্রেমের এক নূতন

তত্ত্ব মূর্ত্তিপরিগ্রহ্ করিল। মানুষের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা—যে শ্রদ্ধা অতি অধমকেও আত্মবিশ্বাসী করিয়া তোলে—তাহাই হইল এই নব-মানব-প্রেমের আদি প্রেরণা।

বুদ্ধ যাহাকে অস্বীকার করিয়া মানুষকে নির্ব্বাণ মুক্তির অভয় লাভ করিতে বলিয়াছিলেন, খ্রীষ্ট তাহাকেই সঞ্জীবিত করিয়া ক্ষমা ও তিতিক্ষার অনুশীলনে পাপমুক্তির আশ্বাস দিয়াছিলেন। চৈতন্য অহৈতুকী শুদ্ধা প্রীতির সাধনা করিতে বলিয়াছিলেন—কামকেই ইন্দ্রিয়লোক হইতে অতীন্দ্রিয় লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমের সন্ন্যাস প্রচার করিয়াছিলেন। কেহই মানুষকে বড় করেন নাই, মানুষের মনুষ্যত্বের দায়কে সাক্ষাৎভাবে তুচ্ছ করিতে শিখাইয়াছিলেন। উভয়েরই শিক্ষায় পাপবোধ ও প্রায়-শ্চিত্তের প্রয়োজন বড় হইয়া আছে; মানুষ কেবলমাত্র মানুষহিসাবে অসৎ—সেই এক পরম সৎকে বিশ্বাস বা তাহার প্রতি অহৈতুকী প্রেমের দ্বারা শুচি হইতে পারিলে, তবে সে ভবভয় হইতে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু এবার প্রেমের নূতন অর্থ হইল—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, জীবের মধ্যেই শিবের সাক্ষাৎকার। মুক্তির সবচেয়ে বড় আদর্শ হইল জীবন্মুক্তি—এই মানুষের সংসারে, জীবরূপেই যে শিবত্বের উপলব্ধি করিয়াছে—মুক্তিকেও যে তুচ্ছ করিয়াছে, সেই প্রকৃত মুক্ত।

শ্রীচৈতন্য 'জীবে দয়া, নামে রুচি' উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি পৃথক 'নামে রুচি'র আবশ্যকতা রাখেন নাই,—কারণ সেই নাম বস্তু হইতে পৃথক নয়, ভগবান ঐ জীবের মধ্যেই আছেন। এই 'জীবে দয়া'র কথা বলিতে বলিতে একবার তিনি সমাধিস্থ হইয়া পরে সমাধিভঙ্গে মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন—"জীবে দয়া? দয়া?—বলিতে লজ্জা হয় না? তুমি কীটাণুকীট!

তুমি দয়া করিবার কে? না! না! দয়া অসম্ভব। জীবকে দয়া নয়—শিবরূপে সেবা কর।"

ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত নবধর্ম্মের সার-সত্য। মানুষকেই নব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা,—পাপবোধ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার ভিতরে যে পরম বস্তু রহিয়াছে তাহারই সহিত পরিচয় সাধন করাইয়া, ক্ষুদ্র 'আমি'কে ব্যষ্টিদেহ হইতে উদ্ধার করিয়া বিরাট সমষ্টি দেহে স্পন্দিত করিয়া তোলা—ইহাই এই নব অবতারের অবতারত্বের হেতু। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-তত্ত্ব এমন করিয়া আর কেহ প্রচার করেন নাই। পরমহংসদেবের 'কালী' এই জীব হইতে শিবে এবং শিব হইতে জীবে গতায়তির সেতু। জ্ঞানের অদ্বৈত-সিদ্ধির শেষে, সচ্চিদানন্দকে আত্মসাৎ করিবারও পরে, যে-প্রেম মহাপুরুষেরই মোহরূপে মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়ান—বৈষ্ণব নয়, পূরা অদ্বৈতীর পক্ষেই সৃষ্টির যে রসরূপ আস্বাদন করা সম্ভব—কালী তাহারই প্রতীক। যে প্রেম অদ্বৈতকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই, বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি, বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি, শিবরূপে জীবের পূজা সম্ভব করিয়া তোলে—এ সেই প্রেম। জগতের আর কোনও প্রেমিক এমন প্রেম প্রচার করেন নাই।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা বিবেকানন্দের মূর্ত্তিই সাধারণের চক্ষে বৃহত্তর হইয়া বিরাজ করে; ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু স্বামীজীর প্রবল ব্যক্তিত্বই যে সাধারণকে অধিক আকৃষ্ট করে, এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তি মন্দিরের অন্ধকারে দেব-বিগ্রহের মত কতকটা রহস্যাবৃত হইয়া আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যে শক্তি বজ্রকেও স্থিরমুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে, অথচ দেখিলে মনে হয় সে মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ নয়, সে যে কত বড় শক্তি, তাহা

আমরা ধারণাও করিতে পারি না। আমরা জানি, বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য—তাঁহারই বাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। তবু দুইজনে কি প্রভেদ! একজন পুরুষ-সিংহ জগতের মহত্তম মহাকাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত; তাঁহার চক্ষে জলদর্চ্চি, কণ্ঠে পাঞ্চজন্য আর একজন শান্ত, আনন্দময়; নেত্র ভাবস্তিমিত, অর্দ্ধনিমীলিত—অধরে করুণার সুধাহাস্য-জ্যোতি; মৃদুকণ্ঠ, স্খলিতবাক্! উভয়ের প্রকৃতির এই পার্থক্যের কথা মঃ রোলাঁ বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে—

The great desciple was both physically and morally his (Ramakrishna's) direct antithesis......The Paramahamsa—the Indian Swan—rested his great white wings on the sapphire lake of eternity, beyond the veil of tumultuous days......Vivekananda could only attain his heights by sudden flights amid tempests...... Even in moments of rest upon its bosom the sails of his ship were filled with every wind that blew. Earthly cries, the sufferings of the ages, fluttered around him like a flight of famished gulls.—*The Life of Vivekananda.*

এখানে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রকৃতিগত যে বৈষম্যের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা যথার্থ হইলেও, এই উক্তির মধ্যে আর একটি অর্থ রহিয়াছে, এবং তাহা সুস্পষ্ট। মঃ রোলাঁ পরমহংসদেবকে এই মর্ত্ত্যজীবনের অবিদ্যা-সম্ভূত ঝড়ঝঞ্ঝার বহু উর্দ্ধে, নীলকান্ত অমৃতহ্রদের উপরে, তাঁহার শুভ্রপক্ষ বিস্তার করিয়া ভূমানন্দে বিভোর থাকিতে দেখিয়াছেন; অপর পক্ষে, শিষ্য বিবেকানন্দ পৃথিবীর ঝড়ঝঞ্ঝা বুকে করিয়া আর্ত্তত্রাণ-ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার গুরুর 'direct antithesis' বা সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণও এই কথায় সায় দিবে। একজন সম্বন্ধে মঃ রোলাঁ বলিতেছেন—'his life had been spent in the serene fulness of the cosmic joy'; আর একজন জীবনে বিশ্রাম চান নাই—'He was energy personified and action was his message to man', এই দুই চরিত্রের কোন্‌টি আধুনিক মানুষের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অধিক অর্জ্জন করিবে, তাহা অনুমান করা দুরূহ নয়। কিন্তু গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে শিষ্য-প্রচারিত গুরুর সেই বাণীও অর্থহীন হইয়া পড়ে। অতএব এই উক্তি, বা সাধারণের এই ধারণা কি অর্থে কতখানি সত্য, তাহারই আলোচনা করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাহিনী যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন, এমনই একটি শিষ্য লাভ করিবার জন্য একদা শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপ আকুল হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রকেই—এই antithesis-কেই—তাঁহার প্রয়োজন ছিল, এবং তাহাকে লাভ করা সহজ হয় নাই। ঘোরতর জ্ঞান-পিপাসা ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রকৃতিতে ছিল দুর্জ্জয় স্বাতন্ত্র্য-কামনা। এ প্রকৃতি আমাদের দেশে বড় ভয়ের কারণ, ইহারাই অবশেষে সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া দুর্গম পথে অন্তর্দ্ধান করে; ইহারাই স্নেহ প্রেম মমতার সকল মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া সেইখানে প্রয়াণ করিতে চায়, যেখানে আছে, মঃ রোলাঁর ভাষায়—'the sapphire lake of eternity beyond the veil of tumultuous days'। তরুণ নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহার ললাটের সেই শৈব-দীপ্তি তাঁহাকে আশান্বিত করিয়াছিল—সেই তেজকে তিনি নিজ করপুটে ধারণ করিয়া জগতের হিতার্থে নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন।

ভাস্কর যেমন তাহার স্বপ্নকে রূপ দিবার জন্য সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় পাষাণ-ফলক খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং মনোগত মূর্ত্তির সহিত অবয়ব ও আয়তন মিলিলে, আনন্দের সীমা থাকে না—শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে পাইয়া তেমনই আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কঠিন প্রস্তর যেমন ছেদনীকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়া লাবণ্যের কোমলতা অর্জ্জন করে—বিবেকানন্দও গুরুর হাতে তেমনই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সহজে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আত্মসমর্পণ করেন নাই। মঃ রোলাঁ তাঁহার যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বার-বার উল্লেখ করিয়াছেন—সে ঝড় তুলিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ; সে ঝড় ধারণ করিবার উপযুক্ত মহাসাগর তিনি এই শিষ্যের মধ্যে চাক্ষুষ করিয়াছিলেন।

গুরুশিষ্যের মধ্যে সেই সংগ্রামের কথা এবং সেই সংগ্রামে শিষ্যের পরাজয়, আত্মদান ও আত্মাহুতির মর্ম্ম যে না বুঝিয়াছে, সে এই মহা-নাটকের অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়াছে। নরেন্দ্র প্রথমে আর কোন কথা শুনিবে না, কেবল জানিতে চায়—তিনি সেই 'বস্তু' দেখিয়াছেন ও দেখাইতে পারেন কিনা! যখন আর সংশয় রহিল না যে, এই নিরক্ষর অর্দ্ধোন্মাদ ব্রাহ্মণ সত্যই সেই মহাধনে ধনী, তখন আরও বিস্ময়ের কারণ হইল এই যে, জ্ঞান ও অজ্ঞানের পারে যে পৌঁছিয়াছে সে আবার কিসের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে কি খুঁজিয়া বেড়ায়? পরব্যোমে স্থিত চিদ্‌ঘন আনন্দ-সত্তার আস্বাদন লাভ করিয়াও সে আবার কথা কয়! —তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া মানুষের সঙ্গ চায়! এত বড় ত্যাগ ত্যাগা-ভিমানী নরেন্দ্রও কল্পনা করে নাই; ভারতের অতীত মহাপুরুষগণের মধ্যে কৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্যের মধ্যেও, ত্যাগের এ আদর্শ তাঁহার চোখে পড়ে নাই। আত্মযোগ-সাধনায় যে সিদ্ধ, যে জ্ঞানমার্গী অদ্বৈতের উপাসক, তাহার

একি মতিবিভ্রম !—সে এই বস্তুকে, এই সৃষ্টি এই মায়াস্বপ্নের ছায়া বুদ্‌বুদ্-রাশিকে এমন করিয়া আগুলিয়া রাখিতে চায় কেন ? নরেন্দ্র বুঝিতে পারে না, কেবল দেখে। এই বিস্ময় হইতেই তাহার প্রাণে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল, তাহারই পরিণামে নরেন্দ্রের বিবেকানন্দরূপে জন্মান্তর ঘটিল। ক্রমে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের এই দুর্ব্বলতাকে সে আর এক-চক্ষে দেখিতে লাগিল, এবং পরিশেষে, যে প্রেম জ্ঞানেরই পরম পরিণাম, যে প্রেম একই কালে আত্মোৎসর্গ ও আত্মোপলব্ধির পরাকাষ্ঠা—যাহার বিহনে জ্ঞানের 'সচ্চিদ' অসম্পূর্ণ, নীরস—'আনন্দ' একটা তত্ত্বগত শূন্য-বাদ মাত্র—সেই মহাপ্রেমের পদতলে শিষ্য আপনাকে লুটাইয়া দিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ইষ্টদেবতা 'কালী'কে তিনি প্রথমে বুঝিতে চাহেন নাই ; বৈষ্ণবের সাধন-বিগ্রহ—যাহাকে তিনি স্বীয় উপলব্ধির অতল হইতে উদ্ধার করিয়া নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিযাছিলেন—সেই 'কালী'কে তিনি আদৌ স্বীকার করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি বলিয়াছিলেন—

'How I used to hate Kali and all Her ways ! That was the ground of six years' fight—that I would not accept Her. But I had to accept Her at last !'

—এ পরাজয় ঘটিল কেমন করিয়া ? তিনি নিজেই তাহা বলিতেছেন—

Ramakrishna Paramahamsa dedicated me to Her···I loved him, you see, and that was what held me. I saw his marvellous purity. I felt his wonderful love···His greatness had not dawned on me then.—*The master as I saw him.*

'I felt his wonderful love'.

ইহাই আসল কথা। গুরুর নিকটে ইহাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান দীক্ষা লাভ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ভাবপ্রবণ বাঙালীর চিত্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান উগ্র মদিরার মত সঞ্চারিত হইতেছিল, এবং ক্রমশঃ উহার বিষক্রিয়াই প্রবল হইয়া উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, শতাব্দীর শেষে, যখন সেই বিষক্রিয়ার প্রভাব প্রায় চরমে উঠিয়াছে, তখন এক বাঙালী সন্তানের অপরিমেয় প্রাণশক্তি ও সর্ব্বগ্রাসী মনীষা তাহাকে হজম করিয়া, সেই বিধর্ম্মের বিষকে স্বধর্ম্মের রসায়ণে শোধন করিয়া সঞ্জীবনী সুধারসে পরিণত করিল—বিবেকানন্দের জীবনে সেই শক্তির স্ফুরণ হইল কেমন করিয়া তাহাই আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বুদ্ধিমান বিজেতা জাতির বিষয়জ্ঞান ও কূটনীতির সাফল্য দর্শনে যে পর-ধর্ম্মপ্রীতি, ও তৎসহ নবলব্ধ বিদ্যার যে অভিমান, তাহাই বাঙালীকে আত্ম-ভ্রষ্ট করিতেছিল, এবং স্বাধীন যুক্তিবাদ বা বিবেকের ছদ্মবেশে যে অতিশয় স্বার্থপর অথচ সুকল্পিত ব্যক্তি-ধর্ম্ম সমাজে এক ভয়াবহ আদর্শকে উদ্ধত করিয়া তুলিতেছিল—বিবেকানন্দও প্রথম বয়সে সেই আদর্শে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাও বিশ্বাস করি যে, শেষ পর্য্যন্ত তিনিও বিজয়কৃষ্ণের মত এই ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেন—সেই অতুলনীয় হৃদয়-বল ও কর্ম্মশক্তি শিলাময় শিবত্বে নির্ব্বাণ লাভ করিত, ইস্পাত আবার খনিগর্ভে লুকাইত। কিন্তু ইস্পাত আগুনের মুখে পড়িল—তাহার প্রকৃতির মধ্যে পড়িল—তাহার প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু মিশিয়া গেল যাহাতে জগতের লৌহশৃঙ্খল ছেদন করিবার মত এক-

খানি সুতীক্ষ্ণ আ'ধ নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইল। সে, যুগের সেই তথা-কথিত উচ্চ আদর্শে লুব্ধ অথচ নিরতিশয় অতৃপ্ত ; শতাব্দীব্যাপী মন্থনের শেষে মন্থনোদ্ভূত বিষপানে কাতর—নবযুগের এই নচিকেতা-মৃত্যুর মুখে অমৃতের বাণী শুনিতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু মৃত্যুপুরে—সংসারের বাহিরে—তাহাকে যাইতে হয় নাই ; জীবনের পথেই সে তাহাকে শরীরীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। কেমন করিয়া তাহার সেই উদ্ধত প্রশ্ন স্তম্ভিত হইয়াছিল উত্তর কালে তাহাই স্মরণ করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন—'I felt his wonderful love'

* * *

যে ঝড় ও আগুন তাঁহার জীবনের এক মুহূর্ত্তকে বিশ্রাম দেয় নাই—কর্ম্মের সেই অসীম উন্মাদনার মধ্যেই কত ব্যক্তি তাঁহার ভাবভঙ্গিতে একটা অন্তর্গূঢ় অনাসক্তি ও বাস্তব-বিস্মৃতি প্রয়াস লক্ষ্য করিয়াছেন। কাজ যেন আর কাহার—তাহার নয়! প্রাণ কেবলই ছুটি চাহিতেছে. আত্মার অন্তস্তলে "অকূলশান্তি বিপুল বিরতির" কামনাই জাগিতেছে। কিন্তু উপায় নাই ; যেন কাহার প্রেমে তিনি বাঁধা পড়িয়াছেন, নিজ জীবনের পরম পুরুষার্থ তাঁহারই পদে নিবেদন করিয়াছেন। শিব ছিলেন তাঁহার ইষ্ট দেবতা, সন্ন্যাস ছিল তাঁহার আজন্মের আদর্শ, নির্ব্বিকল্প সমাধির অমৃতরস ছিল তাঁহার একমাত্র লোভের বস্তু ; কিন্তু এ সকলই তুচ্ছ করিয়া তিনি সেই উন্মাদ ব্রাহ্মণের প্রেমে আপনাকে বিকাইয়াছিলেন। সে যে কত বড় শক্তি—যে শক্তি এই পুরুষকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হয়তো তিনিই জানিতেন, আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। স্বামীজীর সেই কথা—'No, the thing that made me do it is a secret that will die with me.'

এইখানে স্মরণযোগ্য। ইহার মধ্যে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার অর্থ আরও স্পষ্ট হয় যখন তাঁহারই মুখে শুনি—'And Ramakrishna made me over to her (Kali). Strange ! He lived only two years after doing that and most of the time he was suffering'—*The Master As I saw Him*—যেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সমস্ত শক্তি শিষ্যের ভিতরে ঢালিয়া দিয়াছিলেন—এ যেন একরূপ 'পরকায়-প্রবেশ'! শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রকট হইবার সময়ে আমরা এইরূপ একটি ঘটনার কথা শুনিয়া থাকি—"আমি আমার সব তোমাকে দিলাম, আমি নিঃস্ব হইলাম" বলিয়া মহাপুরুষ কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে, তাঁহার সেই উদ্দাম অগ্নিবেগের অন্তরালে যে একটি বন্ধনপীড়ার আভাস বারবার পাওয়া যায় ভগিনী নিবেদিতাও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে এক স্থানে তিনি বলিতেছেন—

'It seemed almost as it were by some antagonistic power, that he was 'bowled along from place to place being broken the while,' to use his own graphic phrase. "Oh, I know I have wandered over the whole earth," he cried once, "but in India I have looked for nothing, save the cave in which to meditate !"

'বিবেকানন্দের প্রকৃতি যে তাঁহার গুরু হইতে ভিন্ন তাহা সত্য, কিন্তু আরও সত্য এই যে, এই ভেদ সত্ত্বেও তিনি গুরুরই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন—তিনি যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা গুরুরই আদেশে এবং শেষ পর্য্যন্ত গুরুই যেন তাঁহাকে আছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। নরেন্দ্র দত্তের যাহা কিছু তাহা যেন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াই জগতের সমক্ষে বিবেকানন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কারণ

বিবেকানন্দ-নামক যে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা জগৎবাসী পাইয়াছি, তাহাতে পরমহংসদেব হইতে বিশিষ্ট একটি প্রকৃতির লক্ষণ থাকিলেও, সেই দ্বন্দ্বকে অর্থাৎ নিজের বিরুদ্ধ আদর্শকে স্বামীজী যেন সর্ব্বদা সাবধানে দমন করিয়াছিলেন, বরং, সেই দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান ছিলেন বলিয়াই গুরুর আদর্শকেই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিজ দেহ-মন-প্রাণের সকল শক্তি এমন করিয়া তাহাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন; এই দ্বন্দ্বই যেন তাঁহার শক্তি-স্ফুরণের সহায়তা করিয়াছিল। মঃ রোলাঁ তাঁহার গ্রন্থে স্বামীজীর একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—একবার অতিশয় ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায়, সকল কর্ম্মের অবসান, পূর্ণ-নির্ব্বাণ কামনা করিয়া স্বামীজী লিখিয়াছেন—

Pray for me that my work stops for ever and my whole soul be absorbed in the Mother···The battles are lost and won ! I have bundled my things and am waiting for the great Deliverer. Shiva, O Shiva, carry my boat to the other shore !···That is my true nature ! Works and activities, doing good and so forth are all superimpositions···Bonds are breaking, love dying, work becoming tasteless ; the glamour is off life···The old man is gone for ever. The guide, the Guru, the leader has passed away.

দেখা যাইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল প্রভাব, তাঁহার সেই স্বকীয় প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে নাই। গুরু অপ্রকট হইবার পরেও তাঁহার দেহের সেই অলৌকিক তড়িৎ-স্পর্শ লাভের পরেও, স্বামীজী পওহারী বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মঃ রোলাঁ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—

The latter (Pavhari Baba) would have satisfied his passion for the Divine gulf, wherein the individual soul renounces itself and is

entirely absorbed without any thought of return···Naren was for twenty-one days within an ace of yielding. But for twenty-one nights the vision of Ramakrishna came to draw him back. Finally after an inner struggle of the utmost intensity, whose vicissitudes he always consistently refused to reveal, he made his choice for ever. He chose the service of God in man.

সেই গুরুতর আধ্যাত্মিক সঙ্কটে শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আত্মসাধনা করিয়া ত্রৈলঙ্গস্বামী হইবেন, না জগতের সেবা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ হইবেন—সে প্রশ্নের মীমাংসা কাহার দ্বারা হইয়াছিল, এই ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে! ক্রমাগত একুশ রাত্রি ধরিয়া স্বপ্নে গুরুর সেই করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি অবশেষে সেই মহা-প্রেমিকের পদতলে জন্মের মত আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন।

মঃ রোলাঁ বিবেকানন্দকে তাঁহার গুরুর 'direct antithesis' বলিয়াছেন তাহা সত্য; তাহার পূর্ব্বে ভগিনী নিবেদিতাও এই ধরনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সেই ভেদের মধ্যেই অভেদ-তত্ত্বের—'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'-রূপ যুগ্মসত্তার কথঞ্চিত উপলব্ধি না হইলে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। বিবেকানন্দের সেই বিপরীত প্রকৃতিকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া অবতারকল্প মহাপুরুষ 'আত্মানং সৃজাম্যহং' সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ধ্যানী মহাপুরুষের প্রকৃতিতে প্রেমের যে উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল তাহার উপযুক্ত দেহ-মন তিনি পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দে। আবার যুগধর্ম্মের প্রবল প্রভাব যাহার- প্রকৃতি-গত জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাকে এমন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিলেও, 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং'কে লাভ করিবার জন্যই যে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, সেও সেই মহাপুরুষের মধ্যে তাহা

প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সেবায় নিজের সকল শক্তি উৎসর্গ করিয়াছিল। উভয়ের প্রকৃতিতে যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাহার উল্লেখ ভগিনী নিবেদিতা ও মঃ রোলাঁ উভয়েই একটু বিশেষ ভাবে করিয়াছেন—

Sri Ramakrishna had been, as the Swami himself said once of him, "like a flower" living apart in the garden of a temple, simple, half naked, orthodox, the ideal of the old time in India, suddenly burst into bloom, in a world that had thought to dismiss its very memory. It was at once the greatness and the tragedy of my own master's life that he was not of this type. His was the modern mind in its completeness. In his consciousness the ancient light of the mood in which man comes face to face with God might shine, but it shone on all those questions and all those puzzles which are present to the thinkers and workers of the modern world—*The Master as I saw Him.*

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই চিন্তাব্যাধিগ্রস্ত, শঙ্কাসংশয়ক্লিষ্ট আধুনিক সমাজে নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত আনন্দের উৎসস্বরূপ ছিলেন—একটি ফুলের মত তিনি এই কণ্টকারণ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন ; তিনি ছিলেন আত্মানন্দ পুরুষ, বাহিরের অন্ধকার তাঁহার অন্তর্গহনের জ্যোতিঃশিখা ম্লান করিতে পারে নাই। সেই আলোকে বিবেকানন্দও চক্ষু মেলিয়াছিলেন—কিন্তু কেবল চক্ষে আলো নয়, এ যুগের অনল কুণ্ড তাঁহার বক্ষে অহরহ জ্বলিয়াছিল—তাঁহার চক্ষের সেই আলোক জগতের সকল সমস্যা ও সংশয়-সঙ্কটের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল। মঃ রোলাঁর কথাগুলি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। উভয়েই গুরুশিষ্যের মধ্যে এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, গুরুশিষ্যে এখানে প্রভেদ নাই। একজন জীবনের ভিতর দিয়া, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাবনা-বেদনা দিয়া

যাহা বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে অধীর হইয়া কর্ম্ম-প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন—আর একজন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সে উপলব্ধি আরও গূঢ়, আরও গভীর; এবং গভীর ও সীমাহীন বলিয়াই তাহা কোন কর্ম্মবিধিকে আশ্রয় করিতে পারে নাই; সেই জন্যই একটি নদীপ্রবাহে নিজের সেই তটহীন প্রেমকে প্রবাহিত করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রের উদ্ধত জ্ঞানাভিমান ও প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্য স্পৃহা তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু তিনি আপনার কথাটি তাহাকে বুঝাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"নরেন যেদিন জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য স্ব-চক্ষে দেখিবে সেইদিন উহার সব অভিমান চূর্ণ হইবে, সারা প্রাণ অসীম করুণায় গলিয়া যাইবে।" ইহারই উল্লেখ করিয়া মঃ রোলাঁ বলিতেছেন—

This meeting with suffering and human misery···was to be the flint upon the steel, whence a spark would fly to set the whole soul on fire. And with this as its foundation-stone, pride, ambition and love, faith, science and action, all his powers and all his desires were thrown into the mission of human service and united into one single flame.—*The Life of Vivekananda.*

শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ ভবিষ্যৎ বাণী এবং পরে তাহার এই সার্থকতা কি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে না যে, বিবেকানন্দের জীবনে গুরুর অভিপ্রায়ই পূর্ণ হইয়াছিল? অতঃপর ভগিনী নিবেদিতার মুখে যখন শুনি—

'That sudden revelation of the misery and struggle of humanity as a whole, which has been the first result of the lime-light irradiation of facts by the organisation of knowledge, had been made to him also, as to the European mind. We know the verdict that Europe has passed on it all. Our art, our science, our poetry

for the last sixty years or more, are filled with the voices of our despair. A world summed up into the growing satisfaction and vulgarity of privilege, and the growing sadness and pain of the dispossessed ; and a will of man too noble and high to condone the evil, yet too feeble to avert or arrest it, this is the spectacle of which our greatest minds are aware. Reluctant, wringing her hands, it is true, yet seeing no other way, the culture of the West can but stand and cry, "To him that hath shall be given, and from him that hath not shall be taken away even that which he hath. *Vae Victis* ! Woe to the vanquished !"

Is this also the verdict of the eastern wisdom ? If so, what hope is there for humanity ? I find in my master's life an answer to this question.—*The Master as I saw Him.*

—তখন বিশ্বাস না হইয়া পারে না যে, বিবেকানন্দরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনা-গহনেই নিহিত ছিল। ভাবনা, চিন্তা, আবেগ ও কল্পনা, ভূয়োদর্শন ও মনীষা, এই সকলের সাহায্যে একজনের জীবনে যে বাণীকে আমরা বীরবীর্য্য ও কর্ম্মশক্তিতে মূর্ত্ত হইতে দেখি, সেই বাণীর এক অলৌকিক অপৌরুষেয় অভিব্যক্তি আর একজনের মধ্যে পূর্ব্বেই হইয়াছিল। বিবেকানন্দের পৌরুষ, প্রতিভা ও মহাপ্রাণতার যে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই, তাহার মূল উৎস যিনি, তিনি পাণ্ডিত্য, প্রতিভা বা মনীষার কোন পরিচয় দেন নাই ; অথবা আমরা যাহাকে কর্ম্মানুষ্ঠান বলি তাহাও করেন নাই। তাই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ গুরু ও শিষ্যের মধ্যে একটি ভেদ-রেখা টানিবেই। কিন্তু সেই ভেদ রক্ষা করা সম্ভব কি না, আমি এখানে তাহারই কিঞ্চিত আলোচনা করিলাম। উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ' একটি অখণ্ড অভিন্ন তত্ত্ব হইয়া আছে। মানুষের দৃষ্টি—সে যত বড় মানুষই হউক—পূর্ণ নহে ; জ্ঞান বা ভক্তি দুইয়ের কোনটাই শেষ পর্য্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্ত নহে। তাই ভগিনী নিবেদিতার মত মহীয়সী মহিলাও তাঁহার নিজের গুরুর জন্য একটু পৃথক্ গৌরব দাবী করিয়াছেন—

I see in him the heir to the spiritual discoveries and religious struggles of innumerable teachers and saints in the past of India and the world, and at the same time the pioneer and prophet of a new and future order of development.

কে বলিবে এ গৌরব তাঁহার গুরু বিবেকানন্দের প্রাপ্য নয় ? কিন্তু বিবেকানন্দ কি শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র ? তবে তাঁহাকে আড়ালে রাখিলেন কেন ? বুঝি তাঁহারও দোষ নাই ; গুরু-শিষ্যের এই সম্বন্ধ সত্যই রহস্যময়, আরও রহস্য এই যে, সে সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেও বারবার ভুল হয়,—বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব এত প্রবল যে, মানুষ আমরা এইরূপ প্রকট ব্যক্তিত্বের মহিমায় অভিভূত না হইয়া পারি না।

* * *

সে সম্বন্ধের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একবার এক অপরূপ স্বপ্ন-ভাষায় বিবৃত করিয়াছিলেন। মিষ্টিসিজম্ কাহাকে বলে জানি, কিন্তু মিষ্টিকের অনুভূতি কেমন তাহা জানি না। তথাপি এই কথাগুলিতে যে তত্ত্ব যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই যদি মিষ্টিকের রীতি হয়, তবে বলিব, অপরোক্ষ অনুভূতির যে সত্য তাহা প্রকাশ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট রীতি। এ রীতি দার্শনিক বা সাহিত্যিক রীতি নয়—এমন কি ভাবকে রূপ দিবার যে বিশিষ্ট বাক্‌পদ্ধতিকে আমরা কাব্য বলিয়া থাকি ইহা সেই কবিকর্ম্মও নহে। কবির ভাষায় ইহারই নাম—'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে

চায় কথা কহিবারে', অথচ সে কথা 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ' নয়—অব্যক্তকে বাক্যগোচর করিয়াছে। এ প্রসঙ্গে আমি এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিই তাহার শেষ কথা, তাই ইহা দ্বারাই বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। এখানেও আমি অনুবাদের অনুবাদ দিলাম; দেখা যাইবে যে, শত অনুবাদেও এই দিব্য বারতার দীপ্তি এতটুকু ম্লান হয় নাই। নরেন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাতের উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'একদিন সমাধির অবস্থায় আমার মন একটি আলোকময় পথ ধরিয়া ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর লোকে উঠিতে লাগিল। নক্ষত্রলোক পার হইয়া, সূক্ষ্মতর বিজ্ঞানলোক পার হইয়া আমি উঠিতে লাগিলাম, পথের দুই পার্শ্বে যত দেবদেবীর মানস-মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে এমন দূরতম স্থানে পৌঁছিলাম যেখানে একটি জ্যোতির রেখা দ্বারা দ্বৈত ও অদ্বৈতের সীমা চিহ্নিত রহিয়াছে। সে সীমাও পার হইয়া আমি অখণ্ডের ঘরে পৌঁছিলাম, দেবতারাও সেখানে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করেন না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দেখিলাম সেই জ্যোতির্লোকে সাতজন ঋষি সমাধিস্থ হইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে ও শুচিতায় তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই। বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া আমি তাঁহাদের মাহাত্ম্যের কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, সেই নিস্তরঙ্গ প্রভারাশির এক অংশ জমাট হইয়া একটি দেবশিশুর আকার ধারণ করিল। অতঃপর সেই শিশু সপ্তঋষির একজনের গলায় তাহার সুন্দর বাহু দুইটি জড়াইয়া অমৃত-নিস্যন্দী কলকণ্ঠে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে চাহিল; তাহার মোহনস্পর্শে ঋষির নিস্পন্দ ভাব ঘুচিল, তিনি অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে সেই শিশুর অপূর্ব্ব মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋষির সেই ভাব-বিভোর দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল, ঐ শিশুই

যেন তাঁহার বক্ষের মণি। তখন শিশুও পরম আহ্লাদে তাঁহাকে বলিল —"আমি যাইতেছি, তুমিও আইস।" ঋষি বাক্যস্ফূর্ত্তি করিলেন না, কিন্তু তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি সম্মতি জ্ঞাপন করিল, এবং শিশুর পানে চাহিয়া থাকিতেই তিনি পুনঃ সমাধিমগ্ন হইলেন। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম তাঁহার অঙ্গ হইতে একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া আলোকশিখারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে। নরেনকে দেখিবামাত্র আমি তাহাকে সেই ঋষি বলিয়া চিনিয়াছিলাম।'

এই অপরূপ কাহিনীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-তত্ত্বের পরম-রহস্য নিহিত রহিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা অসম্ভব—অর্থে নয়, ভাবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। কিন্তু ইহা হইতেই অনেকের মনে হইয়াছে, এই গাঢ় নিদ্রার গূঢ় স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যেন শিষ্যকেই তাঁহার গুরু বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। এমন ভুল আর হইতে পারে না। বিবেকানন্দ যদি সেই ঋষি হন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণকেই সেই শিশু বলিয়া বুঝিতে হয়, তাহা হইলে এই স্বপ্ন-নাট্যের নায়ক যে সেই শিশু তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখা যাইতেছে, সেই ঋষি মহাজ্ঞানী, আর সেই শিশু প্রেমের অমৃত-পুত্তলি, —জ্ঞানকে প্রেম স্পর্শ করিতেছে এবং সেই স্পর্শে নিস্পন্দ সাগর রসতরঙ্গে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, যাহা চিদ্‌ঘন তাহাই আনন্দে বিগলিত হইতেছে। ইহার মধ্যে কে বড় কে ছোট, অথবা কাহাকে বাদ দিয়া কে স্বয়ম্পূর্ণ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জ্ঞান সেই প্রেমকে তাহার অন্তরের ধন বলিয়া চিনিতে পারে, এবং তাহাতেই যেন গভীরতর আত্মোপলব্ধির আবেশে পুনরায় সমাধিমগ্ন হয়। এই সমাধি-স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ

আপনাকে আপনি দেখিতেছেন, অথচ সে দেখার মধ্যে অহংজ্ঞান নাই। এমন আত্মহারা আত্মপরিচয়-দান মানুষের কাহিনীতে দুর্ল্লভ। আপনারই গৌরব অপরে সমর্পিত হইতেছে—প্রেম শিশুরূপে জ্ঞানের কণ্ঠলগ্ন হইতেছে; তাহাতে যেমন আত্মাভিমান নাই, তেমনি আত্ম-সঙ্কোচও নাই। 'আমি যাইতেছি তুমিও আইস'—ইহা মিনতি না আদেশ? মানুষের ভাষায় তাহা বুঝানো যায় না।

সেই ঊর্দ্ধলোকের দৃশ্য নিম্নে পৃথ্বীতলেও অভিনীত হইয়াছিল। নরেন্দ্র এখানেও সেই শিশুর প্রতি তেমনই মুগ্ধনেত্রে চাহিয়াছিলেন। সেই মুখ তিনি জীবনে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, এবং বারংবার বলিয়াছিলেন—'I felt his wonderful love.'

সেই শিশুর স্পর্শেই ক্ষণকালের জন্য ঋষির সমাধি-ভঙ্গ হইয়াছিল; তারপর আবার সেই সমাধি!—কতকালের জন্য কে জানে?

———